Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সমাসের শ্রেণিবিভাগ

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অসীম সরকার
Published online	October 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v50i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.2
Pages	৪১-৭৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সমাসের শ্রেণিবিভাগ

Check for updates

অসীম সরকার*

বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। কিন্তু প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ অনেকাংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবর্তন। সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র দ্বারা বিশ্লেষিত। বিবর্তনের পথ ধরে বাংলা ভাষা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত গতিপথে অগ্রসর হচ্ছে এবং বাংলা ব্যাকরণ পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত হচ্ছে। বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষার কিছু কিছু শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের অনেক বৈচিত্র্য বা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। ফলে বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং করছে। ক্রমেই বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাস। বাংলা ব্যাকরণেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দগঠনের অন্যতম উপায় বা রীতি হচ্ছে সমাস। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ, মিলন বা একাধিক পদের একপদীকরণ। পরস্পর অর্থসম্বন্ধযুক্ত (অর্থের দিক থেকে মিল রয়েছে এমন) একাধিক পদের একপদে সংক্ষিপ্ত হওয়া তথা দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো সমাস। উক্ত হয়েছে – "একপদীভাবঃ সমাসঃ"[১] অর্থাৎ একাধিক পদের একপদীভাবই (একপদে পরিণত হওয়াই) সমাস। যেমন– 'গঙ্গায়াঃ জলম্' ('গঙ্গার জল') = গঙ্গাজলম্। এখানে 'গঙ্গায়াঃ জলম্' ('গঙ্গার জল') পদ দুটির মধ্যে একটি অর্থগত সম্বন্ধ রয়েছে। 'গঙ্গায়াঃ জলম্' ('গঙ্গার জল') না বলে 'গঙ্গাজলম্' বললে যে কেবল সংক্ষেপে বলা হলো তা নয়, সুন্দর করেও বলা হলো। বাগ্‌যন্ত্রের সুবিধা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দ একই সঙ্গে বিধান করার এ কৌশল বা প্রক্রিয়াটি ব্যাকরণে সমাস বলে পরিচিত। ভাষায় সমাসের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। তবে সমাস কেবল বাক্যকে সংক্ষিপ্তই করে না, বাক্যের শ্রুতিমাধুর্য এবং ভাব প্রকাশের শক্তিও বৃদ্ধি করে। অনাবশ্যকভাবে বড় আকারে প্রকাশ না করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হলে বক্তব্য অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। সমাসের মাধ্যমে ভাষা সহজ-সরল, শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও ছন্দোময় হয়। এসব কারণে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সমাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাসের স্বরূপ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে হলে এর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। সমাসের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার অধিকতর অর্থবহ ও সহজ হয়। দৃষ্টিভেদে সমাসের অনেক প্রকার বিভাগ হতে পারে। বৈয়াকরণগণও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাসের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বাংলা বৈয়াকরণগণের মধ্যেও মতভেদের অন্ত নেই। সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে সমাসের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বৈসাদৃশ্যও পরিদৃষ্ট হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের আলোকে সমাসের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

সমাসগঠনে কোথাও প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ অর্থাৎ পূর্বপদ ও উত্তরপদের (বা পরপদের) অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, কোথাও পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, কোথাও উত্তরপদের অর্থ প্রধান হয়, আবার কোথাওবা পূর্ব বা উত্তর কোনো পদের অর্থ প্রধান না হয়ে তদাশ্রিত একটি পৃথক অর্থ ফুটে ওঠে। এভাবে পদার্থের প্রাধান্যে সমাসবদ্ধ পদগুলো চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে; যেমন– (১) পূর্বপদের অর্থ-প্রধান সমাস, (২) উত্তরপদের অর্থ-প্রধান সমাস, (৩) উভয়পদের অর্থ-প্রধান সমাস এবং (৪) অন্যপদের অর্থ-প্রধান সমাস বা উভয়পদের অর্থাশ্রিত তৃতীয় অর্থদ্যোতক সমাস। সংস্কৃতে প্রাচীন বৈয়াকরণগণও ব্যবহৃত পদের অর্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে (পূর্বপদ ও উত্তরপদের অর্থ-প্রাধান্য বিচার করে) সমাসকে চার ভাগে ভাগ করে (১) অব্যয়ীভাব, (২) তৎপুরুষ, (৩) বহুব্রীহি এবং (৪) দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত করেছেন। সচ্চিদানন্দের ভাষায়, "পূর্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ, উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ, অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ[২], উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ" (সচ্চিদানন্দ, ১৯৭৮ : ১৭) অর্থাৎ পূর্বপদের অর্থ প্রধান হলে অব্যয়ীভাব, উত্তরপদের অর্থ প্রধান হলে তৎপুরুষ, অন্যপদের অর্থ প্রধান হলে বহুব্রীহি এবং উভয়পদের অর্থ প্রধান হলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন– মক্ষিকাণাম্ অভাবঃ = নির্মক্ষিকম্। এখানে পূর্বপদার্থ অভাবেরই প্রাধান্য বর্তমান। 'নির্মক্ষিকম্ স্থানম্ এতৎ' বললে এ স্থানে মক্ষিকার অভাব — এরূপ অর্থ প্রকাশ পায়। অভাব অর্থে 'নির্' অব্যয়টি পূর্বপদ এবং সমাসে তার অর্থই প্রধান। অতএব পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্যহেতু 'নির্মক্ষিকম্' অব্যয়ীভাব সমাস। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ। সমাসঘটক পদসমূহের মধ্যে যে-পদটি 'উদ্দেশ্য' (যার সম্বন্ধে কিছু উক্ত হয়, তা উদ্দেশ্য), তারই অর্থ প্রধান বলে গণ্য হয়। বস্তুত তা কর্তৃপদ, অতএব 'বিশেষ্য' ও 'প্রথমান্ত'। 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই বিগ্রহবাক্যে 'পুরুষঃ' উদ্দেশ্য, কারণ তারই পরিচায়ক বিশেষণরূপে 'রাজ্ঞঃ' বলা হচ্ছে। অতএব 'পুরুষঃ' পদের অর্থই উক্ত বাক্যের সমাস-নির্ণয়ে প্রধান। 'রাজপুরুষো গচ্ছতি' বললে 'রাজস্বামিকঃ পুরুষো গচ্ছতি' বোঝায়। গমনকারী ব্যক্তি পুরুষ, রাজা নন। 'পুরুষঃ' পদটি সমাসে উত্তরপদ। অতএব উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্যহেতু 'রাজপুরুষঃ' তৎপুরুষ সমাস। মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ = মহাবাহুঃ। এখানে 'মহৎ' ও 'বাহু' শব্দের কোনোটিরই অর্থ প্রধান নয়। 'মহাবাহুঃ' পদে যে ব্যক্তির মহান বাহু আছে তাকে বোঝায়।

অতএব 'মহৎ' ও 'বাহু' বহির্ভূত অন্যার্থের প্রাধান্যহেতু 'মহাবাহুঃ' বহুব্রীহি সমাস। রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ = রামলক্ষ্মণৌ। রামলক্ষ্মণৌ বনম্ অগচ্ছতাম্ — এই বাক্যে 'রাম' ও 'লক্ষ্মণ' উভয়ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান, কারণ গমন ক্রিয়া সম্পাদনে কেউ অপ্রধান নন, প্রত্যেকেই সমান ও স্বতন্ত্র। 'রাম' ও 'লক্ষ্মণ' উভয়েরই গমনকর্তৃত্ব বোঝাচ্ছে। অতএব উভয় পদের অর্থের প্রাধান্যহেতু 'রামলক্ষ্মণৌ' দ্বন্দ্ব সমাস।

সমাসগঠনের মূল ভিত্তি দুটি পদ, এ কারণে অর্থপ্রাধান্যের দিক থেকে সমাস চার শ্রেণির অধিকভাগে বিভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে কোনো কোনো বৈয়াকরণ অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ সমাস ব্যতীত আরো দুটি বিভাগ স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস; সে হিসেবে সমাস ছয় প্রকার। কিন্তু পদের অর্থ-প্রাধান্যবিচারে কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস নয়। কর্মধারয়ও উত্তরপদার্থপ্রধান সমাস, অতএব তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত; তৎপুরুষ সমাসেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র।[৩] দ্বিগুও বিশেষণ-বিশেষ্যের সমাস, এ সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং উত্তরপদ বিশেষ্য। কর্মধারয় সমাস যেহেতু বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন বিশেষণের সমাস, সেহেতু দ্বিগু সমাস কর্মধারয়ের অন্তর্ভুক্ত।[৪] ফলত অর্থ-প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু একই শ্রেণির অন্তর্গত। সচ্চিদানন্দের মতে, "তৎপুরুষবিশেষঃ কর্মধারয়ঃ। তদ্বিশেষো দ্বিগুঃ" (সচ্চিদানন্দ, ১৯৭৮ : ১৭)। অতএব পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে সমাস চার প্রকার।

সংস্কৃতের ন্যায় বাংলায়ও পদার্থের প্রাধান্যবিচারে সমাস অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব– এই চার প্রকার; কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস নয়। তবে বাংলায় অধিকাংশ বৈয়াকরণের মতে, কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস। বাংলায় অধিকাংশ বৈয়াকরণ সরাসরি ছয় প্রকার সমাস স্বীকার করেছেন।

সংস্কৃতে সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের এক ধরনের সমাস হয় যেগুলো অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ সমাসের মধ্যে পড়ে না, অর্থাৎ অব্যয়ীভাবাদি সমাসের নিয়ম-বহির্ভূত। যেমন– ভূতপূর্বঃ, দৃষ্টপূর্বঃ ইত্যাদি। এরূপ সমাস সুপ্‌সুপা (বা সহসুপা) সমাস (কেবলসমাস) নামে অভিহিত। অতএব সুপ্‌সুপা সমাসসহ সমাস পাঁচ প্রকার।

বাংলায় তৎসম শব্দের ব্যবহারে সুপ্‌সুপা সমাসবদ্ধ পদ পরিলক্ষিত হয়। তবে তা তৎপুরুষ সমাস বলে অভিহিত। মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, "সপ্তমী তৎপুরুষের তৎসম শব্দে কখনও কখনও 'পূর্ব' শব্দের পরনিপাত হয়। সংস্কৃতে এইগুলিকে সুপ্‌সুপা-সমাসের অন্তর্গত করা হয়।" (এনামুল, ২০০৩ : ১৫৪)। যেমন– পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে শ্রুত = শ্রুতপূর্ব ইত্যাদি। অর্ধমৃত(অর্ধরূপে মৃত), ঘনসন্নিবিষ্ট (ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট) প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে সুপ্‌সুপা সমাস বলে চিহ্নিত। বাংলায় কিন্তু দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হিসেবে চিহ্নিত।

বাভটাদি বৈয়াকরণদের মতে, পদের প্রাধান্যভেদে সমাস পাঁচ প্রকার; যেমন– (১) পূর্বপদপ্রধান, (২) মধ্যপদপ্রধান, (৩) অন্ত্যপদপ্রধান, (৪) সর্বপদপ্রদান এবং (৫) অন্যপদপ্রধান।[৫] যথাক্রমে উদাহরণ – কুম্ভস্য সমীপম্ = উপকুম্ভম্, পটস্য নাধিকরণমিতি = পটানধিকরণম্[৬], জলস্য প্রবাহঃ = জলপ্রবহঃ, হরিশ্চ হরশ্চ = হরিহরৌ, দশ আননানি যস্য সঃ = দশাননঃ। বর্তমানে কোনো ব্যাকরণগ্রন্থে সমাসের এরূপ শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয় না। অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগের সঙ্গে এরূপ শ্রেণিবিভাগের কোনো সম্বন্ধ নেই। এছাড়া এরূপ বিভাগে সমাসের কোনো নামকরণ নেই, সমাসে কোন পদের প্রাধান্য

প্রকাশ পায়, এই বিভাগ তারই পরিচায়ক। এই জাতীয় বিভাগে কোনো ব্যতিক্রম থাকার সম্ভাবনা নেই। উল্লেখ্য যে, বাংলায় এরূপ শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয় না।

কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে, সমাস আবার সাত প্রকার। যেমন– অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব এবং নিত্য। সমাসের এরূপ শ্রেণিবিভাগ নিয়ে একটি ছড়া (কারিকা) আছে –

দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং মদ্‌গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ।
তৎপুরুষ কর্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ। (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭ : ৪৪৩)

কোনো কোনো বৈয়াকরণ আবার নিত্যসমাসের পরিবর্তে 'উপপদ সমাস' স্বীকার করেন। যেমন, গুরুপদ হালদার লিখেছেন, "যশ্চোপপদসংজ্ঞোঽন্যস্তেনাসৌ সপ্তধা মতঃ (গুরুপদ, ১৩৫০ : ১৯৬)। তবে কেউ কেউ আবার 'নিত্যম্' পদস্থানে 'সততম্' পাঠ গ্রহণ করেন। সে হিসেবে সমাস ছয় প্রকার।

অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদ অব্যয়ের অর্থ প্রধান হওয়ার কথা। কিন্তু অব্যয়ীভাব সমাসের এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যার উত্তরপদ অব্যয় বলে উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। যেমন– সূপস্য লেশঃ = সূপপ্রতি। 'সূপপ্রতি' পদের অর্থ ব্যঞ্জনের এক বিন্দু। এক্ষেত্রে 'বিন্দু' অর্থে ব্যবহৃত উত্তরপদ 'প্রতি' অব্যয়ের প্রাধান্য বর্তমান। অতএব এটা উত্তরপদার্থপ্রধান অব্যয়ীভাব সমাস। 'উন্মত্তগঙ্গম্' অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা একটি সংজ্ঞা। 'উন্মত্তগঙ্গম্' একটি দেশের নাম, 'উন্মত্ত গঙ্গা' নয়। অতএব সমাসঘটক 'উন্মত্ত' অথবা 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ প্রধান নয়, তদ্‌বহির্ভূত 'উন্মত্তগঙ্গ' নামক দেশের অর্থ এখানে প্রধান। ফলত এটা অন্যপদার্থপ্রধান। কোনো পদই অব্যয় নয় অথচ তাদের সমাসটি অব্যয়ীভাব, এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। যেমন– সমভূমি, মধ্যেগঙ্গম্ ইত্যাদি। পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ এবং সমাসের অর্থ সমাহার হলেও দ্বিগু সমাস গণ্য না হয়ে অব্যয়ীভাব সমাস হয়, এমন দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়। যেমন– একবিংশতিঃ ভারদ্বাজাঃ বংশ্যাঃ = একবিংশতিভারদ্বাজম্, সপ্তানাং গঙ্গানাং সমাহারঃ = সপ্তগঙ্গম্ ইত্যাদি। অতএব পূর্বপদার্থপ্রধান হলেই অব্যয়ীভাব এবং অব্যয়ীভাব হলেই পূর্বপদার্থপ্রধান হবে এমন প্রস্তাব সর্বতোভাবে গ্রহণীয় নয়।

বাংলায়ও কিছু কিছু অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পূর্বপদ না হয়ে পরপদ হয়। যেমন– জনপ্রতি, মণপ্রতি, মাথাপিছু, লোকপিছু ইত্যাদি। তবে পূর্ব বা পর কোনো পদই অব্যয় নয়, বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসের এমন দৃষ্টান্ত সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। করুণাসিন্ধু দাসের মতে, "অব্যয় উপাদান ছাড়া বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাস থাকার অবকাশ নেই" (করুণাসিন্ধু, ২০০৫ : ১৫০)। এছাড়া বাংলায় সমাহার অর্থে গঠিত সকল পদই দ্বিগু সমাস নামে স্বীকৃত।

তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের অর্থ প্রধান হওয়ার কথা। কিন্তু তৎপুরুষ সমাসের অনেক দৃষ্টান্তে উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য প্রতীয়মান হয় না। যেমন– মালাম্ অতিক্রান্তঃ = অতিমালঃ। 'অতিমালঃ' পদের অর্থ যা মালাকে অতিক্রম করেছে তা। পদটিতে পূর্বপদ

'অতি'র অর্থ প্রধান। পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্যহেতু এখানে অব্যয়ীভাব সমাস হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে পড়লেও সমাহার দ্বিগুতে কিন্তু উত্তরপদের অর্থ প্রধান না হয়ে অন্যপদার্থ (অর্থাৎ সমাহার) প্রধান হয়। যেমন– সপ্তানাং পদানাং সমাহারঃ = সপ্তপদী, ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ = ত্রিভুবনম্ ইত্যাদি। নাস্তি কিঞ্চন যস্য সঃ = অকিঞ্চনঃ, নাস্তি কুতো ভয়ং যস্য সঃ = অকুতোভয়ঃ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্যপদার্থের প্রাধান্য বোঝালেও তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। তৎপুরুষের একটি বিশেষ শ্রেণি কর্মধারয়। এ কারণে কর্মধারয় সমাসে উত্তরপদের অর্থ প্রধান হওয়ার কথা। কিন্তু এমন কর্মধারয় দুর্লভ নয় যার পূর্বপদের অর্থ প্রধান। যেমন– ময়ূরো ব্যংসকঃ = ময়ূরব্যংসকঃ। অতএব তৎপুরুষ সমাস উত্তরপদার্থপ্রধান, পূর্বপদার্থপ্রধান ও অন্যপদার্থপ্রধান হতে পারে। তাই উত্তরপদার্থপ্রধান হলেই তৎপুরুষ এবং তৎপুরুষ হলেই উত্তরপদার্থপ্রধান হবে এমন মত সর্বতোভাবে গ্রহণীয় নয়।

বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে এ দুয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো অর্থ প্রধানরূপে বোঝানোর কথা। কিন্তু বহুব্রীহি সমাসের অনেক দৃষ্টান্তে অন্যপদার্থের প্রাধান্য প্রতিভাত হয় না। যেমন– দ্বৌ বা ত্রয়ো বা = দ্বিত্রাঃ। 'দ্বিত্রাঃ' এ সমাসবদ্ধ পদের অর্থ দুই অথবা তিন। পদটিতে 'দ্বি' ও 'ত্রি' এতদুভয় পদেরই অর্থ প্রধান, কেননা কোনো পদই কারও (দুই বা তিনের) বিশেষক বা পরিচায়ক নয়। উভয় পদের অর্থের প্রাধান্যহেতু 'দ্বিত্রাঃ' পদে সমাস হওয়া উচিত ছিল দ্বন্দ্ব, কিন্তু বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। 'উপদশাঃ' (দশানাং সমীপে যে সন্তি তে), 'আসন্নবিংশাঃ' (বিংশতেঃ আসন্নাঃ) প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাসের ক্ষেত্রে পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য স্পষ্ট। অতএব বহুব্রীহি সমাস অন্যপদার্থপ্রধান, উভয়পদার্থপ্রধান, পূর্বপদার্থপ্রধানও হয়। তাই অন্যপদার্থপ্রধান হলেই বহুব্রীহি এবং বহুব্রীহি হলেই অন্যপদার্থপ্রধান হবে এমন যুক্তি সর্বতোভাবে গ্রহণীয় নয়।

দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থ প্রধান হওয়ার কথা। কিন্তু সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে তা হয় না। সমাহার দ্বন্দ্বে সমস্যমান পদের পৃথক অর্থের নয়, সমষ্টিগত অর্থেরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। যেমন– দন্তাশ্চ ওষ্ঠৌ চ = দন্তৌষ্ঠম্/দন্তোষ্ঠম্। 'দন্তাশ্চ ওষ্ঠৌ চ' এ বিগ্রহবাক্যের অর্থ 'দন্তসমূহ ও ওষ্ঠদ্বয়', কিন্তু 'দন্তৌষ্ঠম্'/'দন্তোষ্ঠম্' এ সমস্তপদে 'দন্তসমূহ ও ওষ্ঠদ্বয়ের সমষ্টি' এরূপ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। এই সমষ্টিগত অর্থ সমাসঘটক কোনো পদের অর্থ নয়। এটা তদ্‌বহির্ভূত, অথচ এই অর্থই এখানে প্রধান। ফলত এখানে যে সমাস তা অন্যপদার্থপ্রধান। অন্যপদের অর্থের প্রাধান্যহেতু এখানে বহুব্রীহি সমাস হওয়া উচিত, কিন্তু সমাহার দ্বন্দ্ব হয়েছে। অতএব উভয়পদার্থপ্রধান হলেই দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হলেই উভয়পদার্থ প্রধান হবে এমন মত সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাচীন বৈয়াকরণগণ পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ সমাসের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তা অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বহু ব্যতিক্রম রয়েছে। অনেক বৈয়াকরণ এই অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ সমাসের লক্ষণের পূর্বে 'প্রায়েণ' শব্দ প্রয়োগ করেন; যেমন– "প্রায়েণ পূর্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ,

প্রায়েণোত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ, প্রায়েণান্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ, প্রায়েণোভয়-পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ" (গুরুপদ, ১৩৫০ : ১৯২)। এতেও পদার্থের প্রাধান্যভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগ নির্দোষ হয় না। এ কারণেই ভট্টোজিদীক্ষিত[৭] সৌজন্যের সাথে অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ শ্রেণিবিভাগের সমালোচনা করেন এবং পরোক্ষভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি 'সহসুপা' (পা.[৮] ২।১।৪) সূত্রটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবলম্বন করে শব্দের প্রকার ভিত্তিতে সমাসের ছয়টি শ্রেণি নির্ধারণ করেন। প্রাতিপদিক বা নাম, ধাতু, সুবন্ত (সু,ঔ, জস্ প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত নামপদ) ও তিঙন্ত (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ) এই চতুর্বিধ শব্দের সমন্বয়ে সমাস হয়, তবে প্রয়োগে এই চতুর্বিধ শব্দের ষড়্বিধ সমন্বয় দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ —

সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা।
সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষড়্বিধো বুধৈঃ ॥(সচ্চিদানন্দ, ১৯৭৮ : ১৭)

অর্থাৎ সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের, সুবন্ত পদের সঙ্গে তিঙন্ত পদের, সুবন্ত পদের সঙ্গে বিভক্তিহীন কৃদন্ত নাম শব্দের, সুবন্ত পদের সঙ্গে ধাতুর, তিঙন্ত পদের সাথে তিঙন্ত পদের এবং তিঙন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের সমাস হয়। যথাক্রমে উদাহরণ – রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ, পরি অভূষয়ৎ = পর্যভূষয়ৎ, কুম্ভং করোতীতি = কুম্ভকারঃ[৯], কটং প্রবতে ইতি = কটপ্রঃ, অশ্নীত পিবত ইত্যেবং সততম্ অভিধীয়তে যত্র (যস্যাং ক্রিয়ায়াং বা) সা = অশ্নীতপিবতা, কৃন্ত বিচক্ষণ ইতি অভিধীয়তে (বিচক্ষণ! কৃন্ত ইতি) যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা = কৃন্তবিচক্ষণা। ভট্টোজিদীক্ষিতকৃত এই ষড়্বিধ বিভাগে সমাসের কোনো নামকরণ নেই, কিরূপ শব্দের সাথে কিরূপ শব্দের সমাস হয়, এই বিভাগ তারই পরিচায়ক। এই জাতীয় বিভাগে কোনো ব্যতিক্রম থাকার সম্ভাবনা নেই। এই ষড়্বিধ সমন্বয় ব্যতীত সমাসে আর কোনো প্রকার সমন্বয় হয় না। কিন্তু এরূপ শ্রেণিবিভাগের সমালোচনা করে কেউ কেউ বলেন, এই বিভাগ অনুসারে সমাসের সংখ্যা ছয় না হয়ে পাঁচ হওয়া উচিত। কেননা তাঁরা সুবন্ত পদের সঙ্গে তিঙন্ত পদের এবং তিঙন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের সমাসকে একই প্রকারভেদ মনে করেন। কিন্তু এই দুটি সমাস এক নয়, স্বতন্ত্র। কারণ, উভয়ের ক্রমে পার্থক্য আছে। একটিতে সুবন্ত পূর্বপদ এবং তিঙন্ত উত্তরপদ, আর অন্যটিতে তিঙন্ত পূর্বপদ এবং সুবন্ত উত্তরপদ। সর্বস্তরেই 'ক্রমের' একটি বিশেষ মূল্য আছে। ক্রমের গুরুত্ব অস্বীকার করলে সুবন্তের সাথে তিঙন্তের সমন্বয়ে যে-কোনোটি পূর্বপদ বা পরপদ হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে 'পর্যভূষয়ৎ' বিকল্পে অভূষয়ৎপরি' হবে এবং 'কৃন্তবিচক্ষণা' পদও বিকল্পে 'বিচক্ষণকৃন্তা' হবে। কিন্তু তা হয় না। পূর্বপদ ও পরপদের অবস্থানবিষয়ে যখন খেয়ালখুশি চলে না, নিয়ম মানতে হয়, তখন অবস্থানগত পার্থক্যে প্রকৃতিগতভেদ ও সমাসগত পার্থক্যও অবশ্য-স্বীকার্য।

সমাসের এরূপ শ্রেণিবিভাগ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষবর্জিত হলেও এটা সমাসের বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ, আকৃতিগত স্বরূপ নির্ণয়মাত্র। সমাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি এতে ধরা পড়ে না, অতএব পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগেই সমাসের অন্তঃস্বরূপটি ধরা পড়ে। যেমন– 'পীতম্ অম্বরম্ = পীতাম্বরম্' এবং 'পীতম্

অম্বরং যস্য সঃ = পীতাম্বরঃ' এই দুটি ক্ষেত্রেই সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের সমাস, কিন্তু শুধু এইটুকু পরিচয়ে উভয় সমাসের মধ্যে অর্থগত যে পার্থক্য আছে তা ধরা যায় না। একটিতে 'বস্ত্রার্থ', অন্যটিতে 'বস্ত্রপরিহিত ব্যক্তি' প্রধান এবং এই অর্থগত প্রাধান্যের পরিচয়ে সমাসগত যে পার্থক্য এবং সেই পার্থক্যে সমাসদ্বয়ের যে নাম-ভেদ তা নিষ্প্রয়োজন নয়। অনেক পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসবাক্য হয়। আর ব্যাসবাক্য অনুসারেই সমাসের নাম নির্ধারিত হয়। যেমন– রামস্য ঈশ্বরঃ = রামেশ্বরঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), রামঃ ঈশ্বরঃ যস্য সঃ = রামেশ্বরঃ (বহুব্রীহি), রামশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি = রামেশ্বরঃ (কর্মধারয়)। বাংলায়ও বহু পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়। যেমন– গরমিল — মিল নেই যাতে (বহুব্রীহি), মিলের অভাব (অব্যয়ীভাব), নয় মিল (নঞ্তৎপুরুষ) ইত্যাদি। এ কারণেই ব্যাসবাক্য হতে হবে সমস্তপদের অর্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। অতএব সমাস-সাধনে পদের অর্থের দিকে লক্ষ রাখা একান্ত কর্তব্য।

অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসের নাম তাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। এছাড়াও 'সমাসান্ত' (সমাসের অন্তে ব্যবহৃত প্রত্যয়), 'বৈদিক স্বরনির্ণয়' প্রভৃতি বিষয়ে সমজাতীয়তার সংক্ষেপে পরিচয় দিতে হলে অব্যয়ীভাবাদি নামকরণের আবশ্যকতা অপরিহার্য। অব্যয়ীভাবাদি প্রতিটি সমাসেরই নিজস্ব কতিপয় সমাসান্ত প্রত্যয় আছে এবং তারা তত্তৎসমাসের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিহিত হয়, সর্বত্র নয়। স্বরের ক্ষেত্রেও অব্যয়ীভাবাদি সমাসের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসের স্বর একরূপ, অন্য সমাসের অন্যরূপ। অতএব সমাসের স্বরনির্ণয় করতে হলে অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগ অত্যাবশ্যক।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সংক্ষেপে দিতে হলে অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগ একান্ত প্রয়োজন, ভট্টোজিদীক্ষিতোক্ত শ্রেণিবিভাগ দ্বারা তা সম্ভব নয়। এরূপ বিভাগে উক্ত বিষয়গুলোর পরিচয় দিতে হলে সমাসের প্রতিটি উদাহরণের পৃথক পরিচয় (অর্থাৎ কোনটির কী স্বর বা সমাসান্ত) দিতে হবে। সমাসের কোনো শ্রেণিবিশেষের সমষ্টিগত অথবা জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ভট্টোজিদীক্ষিতকৃত শ্রেণিবিভাগ দ্বারা সম্ভব নয়। এটা একমাত্র অব্যয়ীভাবাদি বিভাগের মধ্য দিয়েই সম্ভব। সাধারণত সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের সমাস হয়, কিন্তু তাদের স্বরপার্থক্য শুধু বহিরাকৃতি দেখে ধরা যায় না। স্বরপার্থক্য ধরতে হলে পদার্থগত প্রাধান্যে তাদের অব্যয়ীভাবাদি পৃথক জাতি নির্ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতএব 'আকৃতি' ও 'প্রকৃতি' এই দুই দিক থেকে সমাসের স্বরূপজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। অতএব 'অব্যয়ীভাবাদি' এবং 'সুপাং সুপা...' শ্রেণিবিভাগ অন্যোন্যবিরোধী নয়, পরস্পর পরিপূরক। একটি সমাসের 'আকৃতির', অন্যটি 'প্রকৃতির'; একটি তার শব্দগত, অন্যটি অর্থগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এতদুভয় বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই উপেক্ষণীয় নয়, অতএব উভয়বিধ বিভাগই অভিপ্রেত।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৯৯৫) গ্রন্থে (প্রকৃতি অনুসারে) সমাসকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন– (১) সংযোগমূলক

সমাস, (২) ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস এবং (৩) বর্ণনামূলক সমাস। পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-প্রণীত *ভাষাবিদ্যা পরিচয়* (১৯৮৯) এবং মুহাঃ মনসূর উর রহমান-প্রণীত *ভাষা পরিক্রমা* (২০০৫) গ্রন্থেও সুনীতিকুমারের মতের অনুসরণ দৃষ্ট হয়।

(১) **সংযোগমূলক সমাস :** এই সমাসে সমস্যমান পদসমূহ দ্বারা একাধিক পদার্থের (বস্তুর বা ভাবের) সংযোগ বা সম্মিলন প্রকাশিত হয়। মিলিত পদগুলো কোনোটি কারও অধীন হয়ে থাকে না। দ্বন্দ্ব এই জাতীয় সমাস।

(২) **ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস :** এই সমাসে প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দটিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, কিংবা তার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় যেন তাকে আশ্রয় করে থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু ব্যাখ্যানমূলক সমাসের অন্তর্ভুক্ত এবং অব্যয়ীভাব তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **বর্ণনামূলক সমাস :** এই সমাসে সমস্যমান পদগুলো মিলে যে অর্থ প্রকাশ করে তার দ্বারা অপর কোনো পদার্থের বর্ণনা হয়। বর্ণনামূলক সমাস বহুব্রীহি নামে অভিহিত।

উল্লেখ্য যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* (২০০১) গ্রন্থে কিন্তু সমাসের উপর্যুক্ত ত্রিবিধ শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য ব্যাকরণগ্রন্থেও এরূপ ত্রিবিধ শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয় না।

সমাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমস্যমান পদ দুটি কোথাও বিশেষ্য, কোথাও বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন, কোথাওবা তাদের একটি অব্যয়। মাহবুবুল হক (২০০২) সমস্যমান পদ দুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে তথা পূর্বপদ ও পরপদ বিশেষ্য, বিশেষণ, নাকি অব্যয় তা বিবেচনা করে সমাসের নিম্নরূপ শ্রেণিবিভাগ করেছেন —

১। পূর্বপদ ও পরপদ – দুটিই বিশেষ্য : দ্বন্দ্ব
২। পূর্বপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ : কর্মধারয়, বহুব্রীহি
৩। পূর্বপদ অব্যয় : অব্যয়ীভাব
৪। পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দ : দ্বিগু
৫। পূর্বপদে কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য : তৎপুরুষ ।

পূর্বপদ ও পরপদ – দুটিই বিশেষ্য : মাহবুবুল হকের মতে, দ্বন্দ্ব এই শ্রেণির সমাস। যেমন– কালিকলম, চাবিস্কুট ইত্যাদি। উদাহরণদ্বয়ে পূর্বপদ এবং পরপদ উভয়ই বিশেষ্য। উল্লেখ্য যে, বিশেষ্য ভিন্ন অন্য পদের যোগেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন– লালনীল, যে-সে, নাচ-গান, ধীরে-সুস্থে, সাত-পাঁচ ইত্যাদি। ডাক্তারসাহেব, গোলাপফুল ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদের উভয় পদই বিশেষ্য, কিন্তু এগুলো কর্মধারয় সমাস। দুটি বিশেষ্য পদের সমন্বয়ে বহুব্রীহি সমাসও হয়; যেমন– আশীবিষ, পদ্মনাভ ইত্যাদি। অতএব বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হলেই তা দ্বন্দ্ব, আর দ্বন্দ্ব হলেই তা বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস, একথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়।

পূর্বপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ : মাহবুবুল হকের মতে, কর্মধারয় ও বহুব্রীহি এই শ্রেণির সমাস।

(ক) **কর্মধারয় :** কর্মধারয় সমাস সাধারণত (১) বিশেষণ ও বিশেষ্য, (২) বিশেষণ ও বিশেষণ, (৩) বিশেষ্য ও বিশেষ্য এবং (৪) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদযোগে গঠিত হয়; যথাক্রমে উদাহরণ – ঝরাপাতা, লালসবুজ, লাটসাহেব, মাছভাজা ইত্যাদি। অব্যয়ের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের যোগেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন– সুপুরুষ (অব্যয় ও বিশেষ্য), আরক্ত (অব্যয় ও বিশেষণ)। উদাহরণদ্বয়ে 'সু' ও 'আ' অব্যয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনামের সঙ্গেও বিশেষ্য পদের কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন– একাল, সেকাল, এ-রকম ইত্যাদি ।

(খ) **বহুব্রীহি :** নীলকণ্ঠ (বিশেষণ ও বিশেষ্য), বীণাপাণি (উভয় পদই বিশেষ্য) ইত্যাদি।

পূর্বপদ অব্যয় : মাহবুবুল হকের মতে, অব্যয়ীভাব এই শ্রেণির সমাস। কেননা অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদ (সাধারণত) অব্যয়। করুণাসিন্ধু দাস লিখেছেন, "প্রতিদান, প্রতিহিংসা, প্রতিফল, প্রতিপক্ষ, উপগ্রহ, উপনদী, উপসাগর, উপনগরী, উপদেবতা, প্রত্যঙ্গ, প্রশাখা, বিমাতা, বেগতিক, গরহাজির, বেইমান যে কারও কারও মতে অব্যয়ীভাব তা নিশ্চয় আদ্য উপাদানটি অব্যয় বলেই" (করুণাসিন্ধু, ২০০৫ : ১৫১)।

পূর্বপদ অব্যয় হলেই যদি সমাসটি অব্যয়ীভাব হয় তাহলে প্রাদি-সমাসও অব্যয়ীভাব। কেননা প্রাদি-সমাসের পূর্বপদ উপসর্গ (প্র, পরা ইত্যাদি)। আর উপসর্গও এক ধরনের অব্যয়। যেমন, মাহবুবুল হক লিখেছেন, "যেহেতু উপসর্গও এক ধরনের অব্যয়, তাই উপসর্গযোগে গঠিত সব শব্দই সাধারণত অব্যয়ীভাব"(মাহবুবুল, ২০০২: ৮৯)। কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে, প্রাদি-সমাস অব্যয়ীভাব সমাসের নামান্তর। উক্ত হয়েছে – "ইহা অব্যয়ীভাব-সমাসেরই নামান্তর। 'প্র', 'পরা', 'প্রতি' প্রভৃতি বিংশতিটি তৎসম উপসর্গের সহিত তৎসম কৃদন্ত-পদের অথবা নাম-পদের যোগে যে অব্যয়ীভাব-সমাস হয়, তাহাকে প্রাদি-সমাস বলে" (এনামুল, ২০০৩ : ১৪৯)। করুণাসিন্ধু (২০০৫) দাসের মতে, বাংলায় পূর্বপদে প্র, অতি প্রভৃতি উপসর্গ থাকলে তাদের উপসর্গসমাস বলা যেতে পারে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৯৯৫) গ্রন্থে অব্যয়ীভাব সমাসকে প্রাদি-সমাসের পর্যায়ভুক্ত সমাসরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে অব্যয়ীভাব সমাসকে স্বতন্ত্র সমাস এবং প্রাদি-সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের উপবিভাগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন – "যে তৎপুরুষ সমাসে প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গ বা উপসর্গস্থানীয় অব্যয় পূর্বপদরূপে বসে তাকে প্রাদিতৎপুরুষ সমাস বলে" (সুনীতিকুমার, ২০০১ : ১৩৮)। নঞতৎপুরুষ[১০] ও নঞ্বহুব্রীহি বা নঞর্থক বহুব্রীহি[১১] সমাসের পূর্বপদ অব্যয়। যথাক্রমে উদাহরণ – অম্লান, নিখুঁত। পূর্বপদটি অব্যয় হলে সমাসটি যদি অব্যয়ীভাব হয় তাহলে নঞতৎপুরুষ ও নঞবহুব্রীহি সমাসও অব্যয়ীভাব। কিন্তু কোনো বৈয়াকরণ এগুলোকে অব্যয়ীভাব সমাস বলেন নি। উল্লেখ্য যে, বাংলায় সকল ক্ষেত্রে অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পূর্বপদ নয়। বীপ্সা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অর্থে কখনো কখনো অব্যয় পরপদ হয়। যেমন– মাথাপিছু, জনপ্রতি ইত্যাদি। সাদৃশ্য অর্থে বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসে 'পানা', 'মতো', 'টে' প্রভৃতি অব্যয়ের পরনিপাত লক্ষণীয়। যেমন– কালোমতো বা

কাল্‌চে, চাঁদপানা, ঘোলাটে ইত্যাদি। অতএব পূর্বপদ অব্যয় হলেই সেই সমাস অব্যয়ীভাব, আর অব্যয়ীভাব হলেই তার পূর্বপদ হবে অব্যয়, একথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়।

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দ : মাহবুবুল হকের মতে, দ্বিগু এই শ্রেণির সমাস। যেমন– তিন মাথার সমাহার (মিলন) = তেমাথা, চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা ইত্যাদি। পূর্বপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও উত্তরপদে বিশেষ্য যোগে দ্বিগু সমাস হয় বলে পদ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই সমাসের সঙ্গে কর্মধারয় সমাসের সাদৃশ্য রয়েছে। সংখ্যা যখন বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন তা বিশেষণ। দ্বিগু সমাসেও সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বপদ এবং বিশেষ্য উত্তরপদ হয়ে থাকে। অতএব দ্বিগু সমাস কোনো পৃথক সমাস নয়, এটা মূলত বিশেষণ-বিশেষ্যের কর্মধারয়। উল্লেখ্য যে, অনেক সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ, কিন্তু সেগুলো দ্বিগু সমাস নয়। যেমন– নয় ও ছয় = নয়-ছয় (দ্বন্দ্ব), চারজন বাহিত দোলা = চতুর্দোলা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), চৌ (চার) চাল যার = চৌচালা[১২] (সংখ্যাবাচক বা সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি)। অতএব পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হলেই দ্বিগু সমাস হবে একথা সর্বতোভাবে গ্রহণীয় নয়।

পূর্বপদে কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য : মাহবুবুল হকের মতে, তৎপুরুষ এই শ্রেণির সমাস। কেননা তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে যে বিভক্তি থাকে তা উত্তরপদের কারক-সম্পর্ক নির্দেশ করে। অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদটি কর্ম, করণ প্রভৃতি সম্বন্ধরূপে উত্তরপদের সঙ্গে অন্বিত থাকে। যেমন– নবীনকে বরণ = নবীনবরণ। এখানে পরপদ 'বরণ'-এর মধ্যে ক্রিয়ার যে ভাব নিহিত আছে পূর্বপদ 'নবীনকে' তার কর্ম কারকের মতো। এ কারণে অনেক বৈয়াকরণ বাংলায় বিভক্তি অনুযায়ী নামকরণের পরিবর্তে কারক অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করেছেন। যেমন– কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ ইত্যাদি। সংস্কৃতে কিন্তু পূর্বপদের বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি নামে অভিহিত। তবে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কোনো কোনো বৈয়াকরণ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বা কর্ম তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ বা করণ তৎপুরুষ ইত্যাদি উভয়বিধ নামে অভিহিত করেছেন। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ সংস্কৃতের ন্যায় কেবল দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, যেসব ক্ষেত্রে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের কর্ম, করণ প্রভৃতি কারকের বিভক্তিচিহ্ন বা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ লোপ পায় সেসব ক্ষেত্রে তৎপুরুষ সমাসকে কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ ইত্যাদি বলা যেতে পারে। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় কোনো কোনো পদের ব্যবহারে এবং বিশেষ বিশেষ অর্থে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে কারকের কোনো সম্পর্ক থাকে না। বাংলায় এরূপ ক্ষেত্রে তৎপুরুষ সমাস হলে তাদেরকে কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ প্রভৃতি না বলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি বলাই যুক্তিসংগত। যেমন, করুণাসিন্ধু দাস লিখেছেন, "বাংলা ভাষার বাক্যে পদে বিভক্তিযোগ কোন আবশ্যক শর্ত নয়, বিভক্তির সংখ্যাও বাংলায় প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি নয়, এবং যে কটি বিভক্তি বা তৎস্থানীয় অনুসর্গ আছে তাদের প্রথমা

দ্বিতীয়া ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করবার অসুবিধাও আছে। ফলত দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, তৃতীয়াতৎপুরুষ নামগুলি বাংলায় প্রায় অর্থহীন (হয়ে) দাঁড়ায়। মুশকিলের কথা, এই সমস্যা এড়াতে কর্মতৎপুরুষ, করণতৎপুরুষ ইত্যাদি নামকরণ নতুন এক প্রস্থ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যেমন, সংস্কৃতে মুহূর্তং সুখম্ = মুহূর্তসুখম্ স্থলে যে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ বলা হয়েছে (ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়া থাকায়), সেখানে দ্বিতীয়াটি কর্মে দ্বিতীয়া নয়, ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়া। বাংলায় একে কর্মতৎপুরুষ বললে অমূলক কথাই বলা হবে" (করুণাসিন্ধু, ২০০৫ : ১৪৯)। মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, "তৎসম শব্দে 'কর্ম-তৎপুরুষ' বলা উচিত নহে। কারণ, সংস্কৃতে কর্মকারক ব্যতীত অন্য স্থলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং সমাসে তাহা লোপ হইয়া থাকে" (এনামুল, ২০০৩ : ১৫০)।

সংস্কৃতে গত, আগত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং দ্বিতীয়ান্ত পদের সাথে গত, আগত প্রভৃতি শব্দের সমাস হয়। যেমন- গৃহং গতঃ = গৃহগতঃ, শরণম্ আগতঃ = শরণাগতঃ ইত্যাদি। সংস্কৃতে এরূপ সমাস দ্বিতীয়া তৎপুরুষ নামে স্বীকৃত। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও এরূপ সমাস হয়। যেমন- ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত, শরণকে আগত = শরণাগত, যৌবনকে প্রাপ্ত = যৌবনপ্রাপ্ত ইত্যাদি। অতএব বাংলায় এরূপ তৎপুরুষকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাই যুক্তিসংগত, কর্ম তৎপুরুষ নয়।

সংস্কৃতে ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি নির্দিষ্ট বলে অনায়াসেই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলা চলে। যেমন- মুহূর্তং সুখম্ = মুহূর্তসুখম্। এখানে পূর্বপদে ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে, কর্মে নয়। এ কারণে সংস্কৃতে 'মুহূর্তসুখম্' এই সমাসবদ্ধ পদটি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও ব্যাপ্ত্যর্থে কালবাচক পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- চিরকালব্যাপী সুখী = চিরসুখী, ক্ষণকালব্যাপী স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী ইত্যাদি। বাংলায়ও এরূপ সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাই সঙ্গত, কর্ম তৎপুরুষ নয়। করুণাসিন্ধু দাসের ভাষায়, "বাংলায় একে কর্মতৎপুরুষ বললে অমূলক কথাই বলা হবে" (করুণাসিন্ধু, ২০০৫ : ১৪৯)। কিন্তু জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "ব্যাপ্তি বা ক্রিয়াবিশেষণকে সরাসরি কারক বলা যায় না বলে ব্যাপ্তিকর্ম বা ক্রিয়াবিশেষাত্মক কর্ম স্বীকার করে নিয়ে এদের কর্মতৎপুরুষের মধ্যে ফেলা চলে" (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ২৩৪)। তবে করুণাসিন্ধু দাস এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, "দ্বিতীয়া তৎপুরুষই বা বলব কোন্ মুখে? বরং মুহূর্তব্যাপী সুখ = মুহূর্তসুখ এইভাবে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বললে বুঝি ঠিক হয়। ব্যাপ্তিতৎপুরুষও চলতে পারে" (করুণাসিন্ধু, ২০০৫ : ১৫১)।

বাংলায় ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে কৃদন্ত পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয় এবং ব্যাসবাক্যে ক্রিয়াবিশেষণবাচক পূর্বপদের সঙ্গে 'মাত্র', 'ভাবে', 'রূপে', 'যথা', 'তথা' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় এবং সমাসে তা লোপ পায়। যেমন- মৃদুভাবে ভাষী = মৃদুভাষী, ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট = ঘনসন্নিবিষ্ট, অর্ধরূপে/অর্ধমাত্র স্ফুট = অর্ধস্ফুট, যথা দ্রুত তথা গামী = দ্রুতগামী ইত্যাদি। সংস্কৃতে ক্রিয়াবিশেষণে সর্বদা দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয় বিধায় মৃদুভাষী, নিমরাজি, ধীরগামী প্রভৃতি সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলা হয়েছে। করুণাসিন্ধু দাস

লিখেছেন, "নিমরাজি, আধবোজা, আধমরা, আধপাকা দ্বিতীয়াতৎপুরুষ বা কর্মতৎপুরুষ ধরা হয়ে থাকে আদ্যপদটি ক্রিয়াবিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ হিসেবে সংস্কৃতে দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হওয়ার সুবাদে" (করুণাসিন্ধু, ২০০৫ : ১৫০)। পূর্বে বলা হয়েছে যে, জ্যোতিভূষণ চাকীর (২০০১) মতে, ক্রিয়াবিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষাত্মক কর্ম স্বীকার করে নিয়ে এরূপ সমাসকে কর্মতৎপুরুষ বলা চলে। আমাদের মতে, ক্রিয়াবিশেষণ পদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাই শ্রেয়।

সংস্কৃতে ঊন, হীন, শূন্য, রহিত প্রভৃতি ঊনার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং তৃতীয়ান্ত পদের সঙ্গে ঊন, হীন, শূন্য, রহিত প্রভৃতি ঊনার্থক শব্দের সমাস হয়। যেমন– একেন ঊনঃ = একোনঃ, বিদ্যয়া হীনঃ = বিদ্যাহীনঃ, জ্ঞানেন শূন্যঃ = জ্ঞানশূন্যঃ, বিবেকেন রহিতঃ = বিবেকরহিতঃ ইত্যাদি। সংস্কৃতে এরূপ সমাস তৃতীয়া তৎপুরুষ নামে স্বীকৃত। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও এরূপ সমাস হয়। যেমন– জ্ঞানের দ্বারা হীন = জ্ঞানহীন, জ্ঞানের দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য, ছটাকের দ্বারা কম = ছটাককম ইত্যাদি। অতএব বাংলায় এরূপ সমাসকে তৃতীয়া তৎপুরুষ বলাই যুক্তিসংগত, করণ তৎপুরুষ নয়। তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মতও পরিলক্ষিত হয়। যেমন, মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, "ঊনার্থে সংখ্যা ও পরিমাণবাচক শব্দের সহিত করণ-তৎপুরুষ-সমাস হয়; যথা– এক সংখ্যায় (= এক দ্বারা) কম = এক-কম (কুড়ি); পোয়া পরিমাণে (= পরিমাণ দ্বারা) ঊন = পৌন+এ = পৌনে। এইরূপ – পাঁচ-কম (এক শ); ছটাক-কম (এক সের)" (এনামুল, ২০০৩ : ১৫১)। জ্যোতিভূষণ চাকীর (২০০১) মতে, যে সকল তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে করণত্ব নেই, হেত্বর্থ বা ঊনার্থ রয়েছে তাদের করণ তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে হেত্বাত্মক করণ, ঊনার্থক করণ ইত্যাদি স্বীকার করে নিতে হয়। যেমন– 'ছায়াশীতল' (হেত্বাত্মক করণ তৎপুরুষ) এবং 'তৃণশূন্য', 'তৃণহীন' প্রভৃতি (ঊনার্থক করণ তৎপুরুষ)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৫) 'পোয়া-কম' সমাসবদ্ধ পদটিকে করণ-বাচক – তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে, এটা ঊনার্থক করণ তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন, "'কম' শব্দটিতে কোনও ধাতু নেই, তাই পোয়ার করণত্ব আসবে কী করে? ঊনার্থক করণ ধরলে অবশ্য তা সম্ভব" (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ২৩৫)।

অনেক তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সঙ্গে উত্তরপদের অন্বয় নিমিত্ত, জন্য প্রভৃতি অর্থজ্ঞাপক বিভক্তি বা অনুসর্গ যোগে নির্ণীত হয় এবং নিমিত্ত, জন্য প্রভৃতি নিমিত্তবাচক অংশগুলো বা অনুসর্গ লোপ পায়। যেমন– ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল, রান্নার জন্য ঘর = রান্নাঘর ইত্যাদি। বাংলায় এরূপ সমাসকে নিমিত্তার্থক-তৎপুরুষ/নিমিত্ত-তৎপুরুষ বলে। তবে কোনো কোনো বৈয়াকরণ সংস্কৃতের অনুসরণে এরূপ তৎপুরুষকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসও বলেছেন। আমাদের মতে, এরূপ তৎপুরুষকে চতুর্থী তৎপুরুষ বলাই ভালো।

দানার্থেও বাংলায় তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– দেবকে দত্ত = দেবদত্ত। সংস্কৃতের অনুসরণে কোনো কোনো বৈয়াকরণ দানার্থে গঠিত তৎপুরুষ সমাসকে চতুর্থী তৎপুরুষ

বলেছেন। আবার কারকের নামানুসারে একে সম্প্রদান তৎপুরুষও বলা হয়েছে। মাহবুবুল হকের মতে, "যে সমাসে পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি (কে, রে) কিংবা নিমিত্তবাচক অনুসর্গ (নিমিত্ত, উদ্দেশ্যে, জন্যে) লোপ পায় এবং পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের সম্পর্ক সম্প্রদান কারকস্থানীয় হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ বা সম্প্রদান তৎপুরুষ সমাস বলে। একে নিমিত্ত তৎপুরুষও বলা হয়ে থাকে। তবে সম্প্রদান তৎপুরুষ নামটিই শ্রেয়" (মাহবুবুল, ২০০২ : ৯৬)। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "সম্প্রদান কারক স্বীকার না করলে এ সমাসকে কর্ম তৎপুরুষ বলতে হবে" (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ২৩৫)। *সংসদ ব্যাকরণ অভিধানে* লেখা হয়েছে, "বাংলায় সম্প্রদান কারকের ব্যবহার আর নেই। এই সমাস প্রকৃতপক্ষে কর্ম তৎপুরুষ" (অশোক, ২০০৫ : ১৭৫)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৫) চতুর্থী তৎপুরুষকে উদ্দেশ্যবাচক চতুর্থী-তৎপুরুষ বলেছেন।

সংস্কৃতে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে সমর্থ সুবন্ত পদের সমাস হয়। যেমন– নদ্যাঃ জলম্ = নদীজলম্, অগ্নেঃ শিখা = অগ্নিশিখা ইত্যাদি। এরূপ সমাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদের সমাস হয়। যেমন– দেশের সেবা = দেশসেবা, ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত ইত্যাদি। বাংলায় এরূপ সমাসকে কোনো কোনো বৈয়াকরণ সংস্কৃতের অনুসরণে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলেছেন। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ বলেছেন। ড. মাহবুবুল (২০০২) হকের মতে, এই সমাসের পূর্বপদ যেহেতু পরপদের সম্বন্ধ পদের মতো হয়, সেহেতু এ সমাসকে সম্বন্ধ তৎপুরুষ বলাই শ্রেয়।

সংস্কৃতে অনট্ (ল্যুট্), ঘঞ্, অল্, ক্তিন্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের সমাস হয়। যেমন– অর্থস্য নাশঃ = অর্থনাশঃ, সুখস্য ভোগঃ = সুখভোগঃ ইত্যাদি। এরূপ সমাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও এরূপ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– সূর্যের উদয় = সূর্যোদয়, চন্দ্রের গ্রহণ = চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি। এরূপ তৎপুরুষ সমাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলাই যুক্তিসংগত, সম্বন্ধ তৎপুরুষ নয়।

সংস্কৃতে ষষ্ঠ্যন্ত ও একবচনান্ত একদেশীর (অবয়বীবাচক পদের) সঙ্গে পূর্ব, অপর, অধর, উত্তর প্রভৃতি একদেশবাচক পদের (অবয়ববাচক পদের) সমাস হয়। যেমন– পূর্বং কায়স্য = পূর্বকায়ঃ, অপরং কায়স্য = অপরকায়ঃ ইত্যাদি। সংস্কৃতে এরূপ সমাস একদেশী তৎপুরুষ নামে স্বীকৃত। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও এরূপ সমাস হয়। যেমন – কায়ের পূর্ব (পূর্বভাগ) = পূর্বকায়, রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্র, দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া ইত্যাদি। বাংলায় এরূপ তৎপুরুষ সমাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ (মতান্তরে সম্বন্ধ তৎপুরুষ) বলে। তবে কোনো কোনো বৈয়াকরণ সংস্কৃতের ন্যায় একে একদেশী তৎপুরুষ বলেন। ঋষিদাস বলেছেন, "ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের দুইটি সমস্যমান পদের মধ্যে একটিকে অপরটির একদেশ অর্থাৎ অঙ্গ বুঝাইলে ঐ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসকে একদেশী তৎপুরুষ সমাস বলে" (ঋষিদাস, ১৩৮৮ : ১৪২)। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "একদেশবাচক পদের সঙ্গে যে সমাস হয় তাকে একদেশী সম্বন্ধ তৎপুরুষ অথবা একদেশী সমাস বলে" (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ২৩৬)।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, সমাসের পূর্বপদ কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য হলেই সেই সমাস তৎপুরুষ অথবা তৎপুরুষ হলেই তার পূর্বপদ হবে কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য এ কথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাও বলা যায় যে, মাহবুবুল হক সমস্যমান পদ দুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাসকে যে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম বা ভিন্নতা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অন্য কোনো বৈয়াকরণ সমাসের এরূপ শ্রেণিবিভাগ করেন নি। সমাসের এরূপ শ্রেণিবিভাগ মূলত সমাসের বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ, আকৃতিগত স্বরূপ নির্ণয়মাত্র। সমাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তথা অর্থগত পার্থক্য এরূপ শ্রেণিবিভাগে ধরা পড়ে না। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে অব্যয়ীভাবাদি যে শ্রেণিবিভাগ তাতেই সমাসের অন্তঃস্বরূপ ধরা পড়ে। যেমন– যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ = রামকৃষ্ণ এবং রাম ও কৃষ্ণ = রামকৃষ্ণ। এই দুটি ক্ষেত্রেই সমস্তপদের আকৃতি বা গঠন এক এবং দুটি ক্ষেত্রেই পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য। আকৃতিগত বা গঠনগত দিক থেকে পদদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আকৃতিগত বা গঠনগত দিক থেকে ক্ষেত্রদ্বয়ে একই শ্রেণির সমাস ('বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস') হয়েছে । কিন্তু ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে অর্থগত যে পার্থক্য রয়েছে সে অনুসারে দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুটি সমাস হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে 'রামকৃষ্ণ' পদে একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে বিধায় কর্মধারয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'রামকৃষ্ণ' পদে দুজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে বিধায়, অর্থাৎ উভয়পদের অর্থের প্রাধান্যহেতু, দ্বন্দ্ব সমাস হয়েছে।

পূর্বেও বলা হয়েছে যে, বাংলায় বহু পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়। অতএব কোনো সমস্তপদের সমাস নির্ণয় করতে হলে, পদটি বাক্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝতে হবে। মূল কথা হচ্ছে, আকৃতি অনুসারে নয়, সমস্তপদের অর্থ অনুসারে ব্যাসবাক্য এবং ব্যাসবাক্য অনুসারেই সমাসের নাম নির্ধারিত হয়। অতএব সমাস-সাধনে সমস্তপদের অর্থের দিকে লক্ষ রাখা কর্তব্য।

অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ (বা ষড়্‌বিধ) সমাসের উপবিভাগ নিয়েও সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১। তৎপুরুষ সমাস – *বাররুচসংগ্রহ* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তৎপুরুষ সমাস আট প্রকার।[১৩] যেমন– প্রথমা তৎপুরুষ, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ এবং নঞ্‌তৎপুরুষ। সাধারণত দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে-কোনো বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে উত্তরপদের তৎপুরুষ সমাস হয়। তবে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত পদের সঙ্গেও কখনো কখনো তৎপুরুষ সমাস হয় (কিন্তু অধিকাংশ ব্যাকরণগ্রন্থে প্রথমা তৎপুরুষের উল্লেখ নেই)। 'প্রাপ্তাপন্নে চ দ্বিতীয়া' (পা. ২।২।৪) সূত্র অনুযায়ী দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত 'প্রাপ্তঃ' এবং 'আপন্নঃ' পদের সমাস হয়। যেমন– প্রাপ্তো জীবিকাম্ / জীবিকাং প্রাপ্তঃ = প্রাপ্তজীবিকঃ, আপন্নো জীবিকাম্/ জীবিকাম্ আপন্নঃ = আপন্নজীবিকঃ। অতএব এরূপ সমাস প্রথমা তৎপুরুষ নামে অভিহিত

হতে পারে। পূর্বোক্ত পূর্বকায়ঃ, অপরকায়ঃ ইত্যাদি একদেশী তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটি প্রথমা বিভক্তিযুক্ত বিধায় একে প্রথমা তৎপুরুষ সমাসও বলা হয়। তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদটি প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন– নবঃ পল্লবঃ = নবপল্লবঃ, এখানে পূর্বপদ 'নবঃ' (নব+সু) প্রথমা বিভক্তিযুক্ত। এ হিসেবে কর্মধারয় সমাসকেও প্রথমা তৎপুরুষ সমাস বলা যেতে পারে।

অধিকাংশ বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থেও প্রথমা তৎপুরুষ এ শ্রেণিবিভাগটি পরিলক্ষিত হয় না। তবে *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে দাগ-লাগা, হাতি-কাঁদা, বাজ-পড়া, ঘর-চাপা প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদগুলোকে কর্তৃবাচক প্রথমা-তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে *ভাষাবিদ্যা পরিচয়* গ্রন্থে কর্তৃবাচক (১মা) তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দাগ-লাগা' এবং 'ঘর-চাপা' পদ দুটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায়ও কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে, কর্মধারয় সমাস মূলত প্রথমা তৎপুরুষ। যেমন, জ্যোতিভূষণ চাকী লিখেছেন, "তৎপুরুষ সমাসের মতো কর্মধারয় সমাসেও পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। বস্তুত কর্মধারয় তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত। অন্য তৎপুরুষে সমস্যমান পদ-দুটি ব্যধিকরণ অর্থাৎ ভিন্নবিভক্তিক। আর কর্মধারায় সমবিভক্তিক, অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাপন্ন। এই জন্যে একে প্রথমাতৎপুরুষও বলা চলে" (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ২৩৮)।

সুখং প্রাপ্তঃ = সুখপ্রাপ্তঃ, এখানে 'সুখম্ (সুখ +অম্) পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত থাকায় 'সুখপ্রাপ্তঃ' পদে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। এরূপ – অগ্নিনা দগ্ধঃ = অগ্নিদগ্ধঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ), পুত্রায় হিতম্ = পুত্রহিতম্ (চতুর্থী তৎপুরুষ), ব্যাঘ্রাৎ ভীতঃ = ব্যাঘ্রভীতঃ (পঞ্চমী তৎপুরুষ), গঙ্গায়াঃ জলম্ = গঙ্গাজলম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), শাস্ত্রে প্রবীণঃ = শাস্ত্রপ্রবীণঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ)।

নঞ্তৎপুরুষ – বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে 'নঞ্' অব্যয়ের যে সমাস হয়, তাকে নঞ্তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে 'নঞ্' পূর্বপদ হয় এবং উত্তরপদ বিশেষ্য বা বিশেষণের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। 'নঞ্'-এর 'ন্' এবং ঞ্ ইৎ অর্থাৎ লোপ পায়, 'অ' থাকে। তবে স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'নুট্' (ন্) আগম হয়। যেমন– ন মানুষঃ = অমানুষঃ (নঞ্+বিশেষ্য), ন গণ্যঃ = অগণ্যঃ (নঞ্+বিশেষণ) ইত্যাদি।

সমাসে 'নঞ্' অব্যয়টি বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সচ্চিদানন্দ লিখেছেন,

> তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
> অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ ॥ (সচ্চিদানন্দ, ১৯৭৮ : ২২৬)

অর্থাৎ নঞ্-এর ছয়টি অর্থ; যেমন– সাদৃশ্য, অভাব, ভিন্নতা (অন্যত্ব/ভেদ), অল্পতা, অপ্রশস্ততা এবং বিরোধ। যথাক্রমে উদাহরণ – অব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণসদৃশ), অপাপঃ (পাপের অভাব), অঘটঃ (ঘট থেকে ভিন্ন), অনুদরা (অল্পোদরা), অকালঃ (অপ্রশস্তকাল), অসুরঃ (সুরবিরোধী)। কখনো কখনো 'নঞ্' অব্যয়টি এই ছয়টি অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থও প্রকাশ করে। যেমন– ন সাধ্যম্ = অসাধ্যম্ (সাধ্যের অতীত), ন যশঃ = অযশঃ (অপযশ) ইত্যাদি।

বাংলায়ও বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে নঞ্ অব্যয়ের নঞ্তৎপুরুষ সমাস হয় এবং নঞ্ অব্যয় পূর্বপদরূপে প্রযুক্ত হয়। বাংলায়ও উত্তরপদের প্রথম বর্ণ ব্যঞ্জন হলে নঞ্ স্থানে 'অ' এবং স্বর হলে 'অন্' হয়। যেমন– নয় সত্য = অসত্য, নয় আদর = অনাদর ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, খাঁটি বাংলায় নঞ্-এর স্থানে অ, আ, অনা, না, নি, বি, বে, গর, নির্ প্রভৃতি হয়। যেমন– নয় কেজো = অকেজো, নয় লুনি = আলুনি, নয় ছিষ্টি = অনাছিষ্টি, নয় বলা = নাবলা, নয় খুঁত = নিখুঁত, নয় জোড় = বিজোড়, নয় রসিক = বেরসিক, নয় হাজির = গরহাজির, নয় আশা = নিরাশা ইত্যাদি।

উক্ত আট প্রকার তৎপুরুষ সমাসের বাইরেও এর শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। যেমন– উপপদ তৎপুরুষ (পূর্বোক্ত উপপদ সমাস), প্রাদিতৎপুরুষ, গতিতৎপুরুষ, কুতৎপুরুষ এবং একদেশী তৎপুরুষ।

উপপদ তৎপুরুষ – কৃদন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত উপপদের যে নিত্যসমাস হয় তা উপপদ সমাস। কৃৎপ্রত্যয়যুক্ত পদ হচ্ছে কৃদন্ত পদ এবং সমাসে কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদ হচ্ছে উপপদ। উপপদ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি সাধারণত লোপ পায় এবং কৃদন্ত উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় বলে এরূপ সমাসকে উপপদ তৎপুরুষ বলা হয়। যেমন– কুম্ভং করোতি ইতি = কুম্ভকারঃ। উপপদ তৎপুরুষ সমাসের স্বপদবিগ্রহ হয় না। কেননা কৃদন্ত উত্তরপদটি সমাসের বাইরে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। অতএব উপপদ তৎপুরুষ সমাস হচ্ছে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। এ কারণে বিগ্রহবাক্যে কৃদন্ত উত্তরপদটি ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয় এবং উপপদের সঙ্গে কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ কারক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়।

বাংলায়ও সংস্কৃতের ন্যায় কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা, পকেট মারে যে = পকেটমার ইত্যাদি। বাংলায়ও উপপদ তৎপুরুষ সমাস হচ্ছে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল (২০০৩) হকের মতে, বাংলায় উপপদ তৎপুরুষ শ্রেণিবিভাগটি স্বীকার না করেও পারা যায়। কেননা ছেলেধরা, যাদুকর, ঘরপোড়া প্রভৃতি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্তসমূহের প্রত্যেকটিকে অন্য কোনো সমাসের অন্তর্গত করা যায়। যেমন– ছেলেকে ধরা (কর্ম-তৎপুরুষ); যাদু করে যে = যাদুকর (বহুব্রীহি); হরেক রকম বুলি বলে যে = হরবোলা (বহুব্রীহি); ঘরে পোড়া = ঘরপোড়া (অধিকরণ-তৎপুরুষ) ইত্যাদি। উক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিকেই 'বহুব্রীহি' সমাস বলে গণ্য করা যায়।

প্রাদিতৎপুরুষ – কৃদন্তপদ বা নামপদের সঙ্গে 'প্রাদি'র (প্র, পরা প্রভৃতি নিপাতের) যে সমাস হয়, তাকে প্রাদিতৎপুরুষ বলে। 'প্রাদি' যখন ক্রিয়াপদ ভিন্ন অন্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই কেবল প্রাদিতৎপুরুষ সমাস হয় এবং সমাসে 'প্রাদি' পূর্বপদ হয়। যেমন– শোভনঃ পুরুষঃ = সুপুরুষঃ। প্রাদিতৎপুরুষ সমাসের স্বপদবিগ্রহ হয় না। শোভনার্থ 'সু' নিপাতের বাচ্যার্থ নয়, অতএব 'সু' নিপাত দ্বারা বিগ্রহ সম্ভব নয়, 'শোভন' শব্দের সাহায্যে বিগ্রহবাক্য করা হয়েছে। অতএব প্রাদিতৎপুরুষ হচ্ছে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। তাই পরিশেষে বলা যায় যে, সুবন্ত পদের সঙ্গে 'প্রাদি' নিপাতের যে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস

হয়, তাই প্রাদিতৎপুরুষ। বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী এবং পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে প্রাদির সমাস হয়ে থাকে। এ হিসেবে প্রাদিতৎপুরুষ সমাসকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যথাক্রমে উদাহরণ – প্রকৃষ্টঃ ভাবঃ = প্রভাবঃ, উৎক্রান্তো বেলাম্ = উদ্বেলঃ, অবক্রুষ্টঃ কোকিলয়া = অবকোকিলঃ, পরিগ্লানঃ অধ্যয়নায় = পর্যধ্যয়নঃ, নিষ্ক্রান্তঃ কৌশাম্ব্যাঃ = নিষ্কৌশাম্বিঃ। উত্তরপদ অনুসারে প্রাদিতৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন– কৃদন্তপদের সঙ্গে প্রাদির সমাস এবং নামপদের সঙ্গে প্রাদির সমাস। যথাক্রমে উদাহরণ – প্রবচনম্ (প্র-√বচ্+ল্যুট্), দুর্জনঃ। অব্যয়ীভাব সমাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা প্রাদিতৎপুরুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গতিতৎপুরুষ – প্রাদি (প্র,পরা প্রভৃতি) ও অন্য কতিপয় নিপাত এবং 'চ্বি' ও ডাচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াযোগে 'গতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়ার সঙ্গে 'গতি'র নিত্য সমাস হয়। এরূপ নিত্যসমাস গতিতৎপুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। যেমন– পরাজিত্য, দূরীকৃত্য ইত্যাদি। গতিতৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন পদের লৌকিক বিগ্রহ হয় না, সুতরাং এই সমাস অবিগ্রহ নিত্য। আগচ্ছতি, পরাজয়তে ইত্যাদি তিঙন্তপদে এই সমাস হয় না। কিন্ত মতান্তরে এখানেও 'গতি' সমাস অবৈধ নয়। Macdonell গতিসমাসকে (গতিতৎপুরুষকে) ক্রিয়াপদের সমাস বলেছেন (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭ : ৪৮০)।

কুতৎপুরুষ – সুবন্তপদের সঙ্গে নিন্দার্থক বা ঈষদর্থক 'কু' শব্দের যে নিত্যসমাস হয়, তাকে কুতৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– কুৎসিতঃ জনঃ = কুজনঃ। এরূপ সমাস বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন। সে হিসেবে এটা কর্মধারয়। কুতৎপুরুষ সমাসের স্বপদবিগ্রহ হয় না। 'কু' শব্দের অর্থদ্যোতক 'কুৎসিত' ও 'ঈষৎ' শব্দের সাহায্যে বিগ্রহবাক্য করতে হয়। অতএব কুতৎপুরুষ সমাস হচ্ছে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। সমাসে 'কু' স্থানে কখনো কখনো 'কা' বা 'কৎ' হয়। যেমন– কুৎসিতঃ পুরুষঃ = কুপুরুষঃ; কাপুরুষঃ, কুৎসিতঃ অশ্বঃ = কদশ্বঃ, ঈষৎ জলম্ = কাজলম্ ইত্যাদি।

অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৎপুরুষ সমাসের অন্যরূপ শ্রেণিবিভাগও পরিলক্ষিত হয়। ম্যাকডোনেল-এর মতে, তৎপুরুষ সমাস হচ্ছে সম্বন্ধাবচ্ছেদক সমাসের ভেদ। সম্বন্ধাবচ্ছেদক সমাসে পূর্বপদ উত্তরপদের অর্থকে অবচ্ছেদন (= সীমিত) করে অথবা বিশিষ্ট করে। এ সমাস প্রধানত দুই প্রকার– (১) তৎপুরুষ ও (২) কর্মধারয়। কর্মধারয় আবার দ্বিগু প্রভৃতি নামে অনেক প্রকার (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭ : ৪৬৩)।

তৎপুরুষ সমাসকে পরতন্ত্র সমাসও বলা হয়েছে। বিভক্তি ও কারককে পর্যায়রূপে গণ্য করে কোনো কোনো বৈয়াকরণ তৎপুরুষ সমাসকে কারকতৎপুরুষ বলেছেন। অর্থাৎ কর্মতৎপুরুষ, করণতৎপুরুষ ইত্যাদি নাম দিয়েছেন। বিশ্বরূপ (১৯৯৭) সাহার মতে, এরূপ নামকরণ অপাণিনীয় ও অসংগত।

ব্যধিকরণ ও সমানাধিকরণ ভেদে তৎপুরুষ সমাস দুই প্রকার। বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদের যে তৎপুরুষ তা ব্যধিকরণ (গৃহং গতঃ = গৃহগতঃ) এবং বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্নপদের অর্থাৎ একই বিভক্তিযুক্ত পদের যে তৎপুরুষ তা সমানাধিকরণ (নবম্ অন্নম্

= নবান্নম্)। সমানাধিকরণ তৎপুরুষ হচ্ছে কর্মধারয়। ব্যধিকরণ তৎপুরুষ আবার নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার। দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হচ্ছে অনিত্য ব্যধিকরণ (নখৈঃ ভিন্নঃ = নখভিন্নঃ)। নিত্য ব্যধিকরণ আবার দুই প্রকার — সুবন্তসমাস (সুপুরুষঃ) এবং কৃদন্তসমাস (কুম্ভকারঃ)।

বাংলা তৎপুরুষের উপবিভাগ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২। কর্মধারয় সমাস – *বাররুচসংগ্রহ* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কর্মধারয় সমাস ছয় প্রকার। যেমন– সামান্য, বিশেষ, কুৎসিতপূর্বপদ, উপমানপূর্বপদ, উপমিতপূর্বপদ এবং বর্ণোভয়পদ।

(১) **সামান্য কর্মধারয়** – সমানাধিকরণ বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের যে সমাস হয় তা সামান্য কর্মধারয় সমাস। যেমন– নীলম্ উৎপলম্ = নীলোৎপলম্। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ সমাস নিত্য হয়। যেমন– কৃষ্ণসর্পঃ। এটি অবিগ্রহ নিত্যসমাস। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাস হয় না। যেমন– 'রামো জামদগ্ন্যঃ' (জমদগ্নিপুত্র রাম অর্থাৎ পরশুরাম) এই বাক্যে 'জামদগ্ন্যঃ' বিশেষণ এবং 'রামঃ' বিশেষ্য, সুতরাং কর্মধারয় সমাস হওয়ার কথা, কিন্তু প্রয়োগ নেই বিধায় এক্ষেত্রে সমাস হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামান্য কর্মধারয়কে সাধারণ কর্মধারয় বলা হয়েছে।

বাংলায়ও এরূপ কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন– নীল যে শাড়ি = নীলশাড়ি, ভাঙা যে হাট = ভাঙাহাট ইত্যাদি। বাংলায় এরূপ সমাস সাধারণ কর্মধারয় সমাস নামে স্বীকৃত।

(২) **বিশেষ কর্মধারয়** – বিশেষ্য পদের সঙ্গে পূর্বকালবাচক শব্দ এবং বিশেষণ এক, সর্ব, জরৎ, পুরাণ, নব ও কেবল শব্দের সামানাধিকরণ্যে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন– পূর্বং স্নাতঃ পশ্চাৎ অনুলিপ্তঃ = স্নাতানুলিপ্তঃ, একশ্চাসৌ নাথশ্চেতি = একনাথঃ ইত্যাদি। এরূপ সমাস হচ্ছে বিশেষ কর্মধারয়।

বাংলায়ও পৌর্বাপর্য অর্থে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদের যোগে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন– আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা, আগে ঘষা পরে মাজা = ঘষামাজা ইত্যাদি। ধোয়ামোছা, ঘষামাজা প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসবদ্ধ পদে অর্থভেদে দ্বন্দ্ব সমাসও হয়। যেমন– ধোয়া ও মোছা = ধোয়ামোছা, ঘষা ও মাজা = ঘষামাজা ইত্যাদি। এখানে পৌর্বাপর্য না বুঝিয়ে দুটি ক্রিয়ার মিলন বোঝাচ্ছে অর্থাৎ উভয় পদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হচ্ছে। সংস্কৃতে কিন্তু স্নাতানুলিপ্তঃ, সুপ্তোত্থিতঃ প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসবদ্ধ পদে অর্থভেদে দ্বন্দ্ব সমাস হয় না।

(৩) **কুৎসিতপূর্বপদ কর্মধারয়** – কুৎসাবাচক (নিন্দাবাচক) শব্দের সঙ্গে কুৎসিতের সামানাধিকরণ্যে কর্মধারয় সমাস হয়। সমাসে কুৎসাবাচক পদটি বিশেষণ হলেও বিশেষ্য কুৎসিতবাচক পদটি পূর্বপদ হয়। যেমন– বৈয়াকরণশ্চাসৌ খসূচিশ্চেতি = বৈয়াকরণখসূচিঃ (ব্যাকরণের প্রশ্ন করলে যে অজ্ঞতাবশত আকাশের বর্ণনা করে), মীমাংসকশ্চাসৌ দুর্দুরূঢ়শ্চেতি = মীমাংসকদুর্দুরূঢ়ঃ (মীমাংসক এবং দুষ্কর্মকারী) ইত্যাদি। সমাসে 'কুৎসিতবাচক' শব্দ পূর্বপদ হয় বলে একে কুৎসিতপূর্বপদ কর্মধারয় সমাস বলা হয়েছে।

(৪) **উপমানপূর্বপদ কর্মধারয়** – সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের কর্মধারয় সমাস হয়। সমাসে উপমানবাচক পদটি পূর্বপদ হয়। যেমন– ঘন ইব শ্যামঃ = ঘনশ্যামঃ। সমাসে 'উপমানবাচক' শব্দ পূর্বপদ হয় বলে এরূপ কর্মধারয় সমাসকে উপমানপূর্বপদ কর্মধারয় বলা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ব্যাকরণগ্রন্থে এ সমাস উপমান কর্মধারয় নামে স্বীকৃত। এটা তুলনামূলক (উপমামূলক বা উপমা-প্রধান) কর্মধারয়ের একটি বিভাগ। যে কর্মধারয় সমাসে দুটি অসম জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা বা উপমার মাধ্যমে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয় তাকে তুলনামূলক বা উপমামূলক কর্মধারয় বলে। তুলনামূলক কর্মধারয় তিন প্রকার– (ক) উপমান কর্মধারয়, (খ) উপমিত কর্মধারয় ও (গ) রূপক কর্মধারয়। উপমা বা তুলনার জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন — উপমান, উপমেয় (বা উপমিত) এবং সামান্যবচন (সাধারণ ধর্ম বা সাধর্ম্য)। যার সঙ্গে বা যা দিয়ে তুলনা করা হয় তা উপমান, যার তুলনা করা হয় তা উপমেয় (বা উপমিত) এবং উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম (গুণ বা প্রকৃতি বর্তমান থাকে) তা সামান্যবচন (বা সাধর্ম্য কিংবা সাধারণ ধর্ম)।

বাংলায়ও উপমানবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মবাচক বিশেষণ পদের উপমান কর্মধারয় সমাস হয় এবং সমাসে উপমানবাচক বিশেষ্য পদটি পূর্বপদ হয়। যেমন– কাজলের মতো কালো = কাজলকালো।

(৫) **উপমিতপূর্বপদ কর্মধারয়** – সাধারণ ধর্মের উল্লেখ না থাকলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি উপমান পদের সঙ্গে উপমেয় পদের কর্মধারয় সমাস হয়। সমাসে উপমেয় (উপমিত) পদটি পূর্বপদ হয়। যেমন– পুরুষো ব্যাঘ্র ইব = পুরুষব্যাঘ্রঃ। 'উপমিতবাচক' ('উপমেয়বাচক') শব্দ পূর্বপদ হয় বলে এরূপ কর্মধারয় সমাসকে উপমিতপূর্বপদ কর্মধারয় বলা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ব্যাকরণগ্রন্থে এই সমাস উপমিত কর্মধারয় নামে স্বীকৃত।

বাংলায়ও উপমেয় পদের সঙ্গে উপমান পদের উপমিত কর্মধারয় সমাস হয় এবং উপমেয় পদটি সাধারণত পূর্বে বসে। আর সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না। যেমন– কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব। উপমেয় কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদটি অনেক সময় পরে বসে। মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, "খাঁটি বাংলায় উপমান-বাচক পদ উপমেয় পদের আগে বসে এবং উপমেয় পদ উপমানের সাদৃশ্য বুঝায়" (এনামুল, ২০০৩ : ১৬০)। যেমন– আলু শাঁখের ন্যায় = শাঁখ-আলু, সন্দেশ আমের মতো = আমসন্দেশ ইত্যাদি। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো উপমেয় পদটি পরে বসে। যেমন– অন্ন সুধার মতো = সুধান্ন।

(৬) **বর্ণোভয়পদ কর্মধারয়** – বর্ণবাচক শব্দের সঙ্গে সমানাধিকরণ বর্ণবাচক শব্দের কর্মধারয় সমাস হয়। এরূপ কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়ই বর্ণবাচক শব্দ বিধায় এ সমাসকে বর্ণোভয়পদ কর্মধারয় বলা হয়েছে। যেমন– কৃষ্ণশ্চাসৌ সারঙ্গশ্চেতি = কৃষ্ণসারঙ্গঃ। যেহেতু এখানে দুটি পদই বিশেষণ সেহেতু এদের যে-কোনো একটি বিশেষ্য বলে গণ্য হয় এবং সেটি উত্তরপদ হয়। সে হিসেবে 'সারঙ্গকৃষ্ণঃ' পদও সিদ্ধ হয়।

উপর্যুক্ত ছয় প্রকার কর্মধারয় ব্যতীত রূপক কর্মধারয় এবং মধ্যপদলোপী (বা উত্তরপদলোপী) কর্মধারয় নামে দুটি শ্রেণিও স্বীকৃত।

রূপক কর্মধারয় – উপমান ও উপমেয়ের অভেদ বোঝাতে যে সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় বলে। যেমন– শোক এব সাগরঃ = শোকসাগরঃ, বিদ্যা এব রত্নম্ = বিদ্যারত্নম্ ইত্যাদি। রূপক কর্মধারয়ের ক্ষেত্রে পাণিনীয় কোনো বিধান নেই। বিধায়ক সূত্র না থাকলেও প্রয়োগ যখন আছে তখন তা সমর্থনীয়। যেসব সমাসের কোনো লক্ষণ বিহিত হয় নি, অথচ তৎপুরুষরূপে প্রসিদ্ধ, সেসব সমাস 'ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ' (পা. ২।১।৭২) সূত্রানুসারে সমর্থনীয়। রূপক কর্মধারয়ের কোনো লক্ষণ বিহিত হয় নি, অথচ তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত। অতএব 'ময়ূর-ব্যংসকাদয়শ্চ' সূত্রানুসারে এই সমাস সিদ্ধ। কোনো কোনো ব্যাকরণে 'রূপকমভেদে' এরূপ লক্ষণ (সূত্র) দ্বারা রূপক কর্মধারয় স্বীকৃত।

বাংলায়ও উপমান ও উপমেয়ের অভেদ বোঝাতে উপমেয়বাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের রূপক কর্মধারয় সমাস হয় এবং সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে। আর সাধারণ ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না। যেমন– মনরূপ মাঝি = মনমাঝি, প্রাণরূপ পাখি = প্রাণপাখি ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী (বা উত্তরপদলোপী) কর্মধারয় – 'শাকপার্থিব' প্রভৃতি শব্দে কর্মধারয় সমাস হয়। এক্ষেত্রে দুটি সমাস হয় এবং প্রথম সমাসের উত্তরপদ লোপ পায়। যেমন– শাকঃ প্রিয়ঃ যস্য সঃ = শাকপ্রিয়ঃ (বহুব্রীহি), অতঃপর শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ = শাকপার্থিবঃ (কর্মধারয়)। এখানে প্রথম সমাসবদ্ধ পদের উত্তরপদ 'প্রিয়' লোপ পেয়েছে। 'শাকপার্থিবঃ' প্রভৃতি সমাসে যেহেতু প্রথম সমাসবদ্ধ পদের উত্তরপদ লোপ পায় সেহেতু এরূপ সমাসকে উত্তরপদলোপী কর্মধারয় বলা উচিত। দুটি পদের 'মধ্যে' হয় না, তাই উত্তরপদলোপী কর্মধারয় বলাই বাঞ্ছনীয়। তবে সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্যস্থ পদটি লোপ পাওয়ায় এ সমাসকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলা হয়েছে।

বাংলায়ও এরূপ সমাস হয় এবং তা মধ্যপদলোপী কর্মধারয় নামে অভিহিত। যেমন– দুধ মেশানো সাগু = দুধসাগু, হাতে চালানো পাখা = হাতপাখা ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাসের উপর্যুক্ত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও 'ময়ূরব্যংসকবৎ কর্মধারয়' এরূপ ভেদও কোনো কোনো বৈয়াকরণ স্বীকার করেন যেমন– ময়ূরো ব্যংসকঃ (ধূর্তঃ) = ময়ূরব্যংসকঃ। 'ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ' (পা. ২।১।৭২) সূত্রানুসারে ময়ূরব্যংসক প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৩। **বহুব্রীহি সমাস –** *বাররুচসংগ্রহ* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বহুব্রীহি সমাস ছয় প্রকার; যেমন– তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, সংখ্যোত্তরপদ, অন্তরালাভিধেয়ক, সরূপোপলক্ষিত ও সহপূর্বপদ।

(১) **তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি** – যেখানে সমস্যমান পদার্থ সমাসবাচ্য অন্য পদার্থে বর্তমান থাকে, তা তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। যেমন– ত্রিলোচনঃ (ত্রীণি লোচনানি যস্য সঃ) শিবঃ, লম্বকর্ণঃ (লম্বৌ কর্ণৌ যস্য সঃ) পুরুষঃ। উদাহরণদ্বয়ে সমস্যমান 'লোচন'

অন্যপদার্থ 'শিব' শব্দে এবং সমস্যমান 'কর্ণ' অন্যপদার্থ 'পুরুষ' শব্দে বর্তমান। তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহিতে যেমন অন্যপদার্থ, তেমনি সমাসঘটক পদের অর্থও ক্রিয়া/গুণ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয় অর্থাৎ এ সমাসে বহুব্রীহির প্রতিপাদ্য অন্যপদের ন্যায়, সমস্যমান পদও ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয়। 'লম্বকর্ণং পশ্যতি' বাক্যে দর্শন ক্রিয়ার সঙ্গে ঐরূপ পুরুষ এবং কর্ণ উভয়ই অন্বিত হয়েছে। লম্বকর্ণকে দেখলে কেবল ঐ ব্যক্তিকে দেখা হয় না, তার লম্বা কানও দৃষ্ট হয়।

(২) **অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি** – যেখানে সমস্যমান পদার্থ সমাসবাচ্য অন্যপদার্থে বর্তমান থাকে না, তা অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। যেমন– দৃষ্টসমুদ্রঃ (দৃষ্টঃ সমুদ্রঃ যেন সঃ) পুরুষঃ। এ উদাহরণে সমস্যমান 'সমুদ্র' অন্যপদার্থ দর্শক পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান নেই। 'দৃষ্টসমুদ্রম্ আনয়' বাক্যে আনয়ন ক্রিয়ার সঙ্গে দর্শক পুরুষের অন্বয় রয়েছে, কিন্তু সমুদ্রের অন্বয় নেই। দৃষ্টসমুদ্রকে আনার অর্থ সমুদ্রকেও আনা নয়।

কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে, তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান এবং অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞানভেদে বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার।

(৩) **সংখ্যোত্তরপদ বহুব্রীহি** – সংখ্যেয় বস্তু (গণনীয় পদার্থ) বোঝালে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে অব্যয়, আসন্ন, অদূর, অধিক এবং সংখ্যাবাচক শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয় এবং সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ উত্তরপদ হয়। যেমন– দশানাং সমীপে যে তে = উপদশাঃ, ত্রয়ো বা চত্বারো বা = ত্রিচতুরাঃ ইত্যাদি। সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ উত্তরপদ হয় বলে এরূপ বহুব্রীহি সংখ্যোত্তরপদ বহুব্রীহি নামে অভিহিত হয়েছে। এরূপ বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদগুলো প্রথমা বিভক্তিযুক্ত নয় (সমানাধিকরণ বা একবিভক্তিক নয়) এবং সমস্তপদটি অন্যপদার্থপ্রধানও নয়। অতএব বহুব্রীহি সমাসের সাধারণ (সামান্য) লক্ষণ অনুসারে এখানে বহুব্রীহি হয় নি, সুতরাং এগুলো বিশেষ বহুব্রীহি।

(৪) **অন্তরালাভিধেয়ক বহুব্রীহি** – 'অন্তরাল' (অর্থাৎ মধ্যবর্তী দিক) বোঝালে দিগ্বাচক শব্দের সঙ্গে দিগ্বাচক শব্দের (অর্থাৎ দুটি দিকের নামের মধ্যে) বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– দক্ষিণস্যাঃ পূর্বস্যাশ্চ দিশোঃ যৎ অন্তরালং সা = দক্ষিণপূর্বা (অগ্নিকোণ)। অনুরূপভাবে — উত্তরপূর্বা (ঈশানকোণ), উত্তরপশ্চিমা (বায়ুকোণ), দক্ষিণপশ্চিমা (নৈর্ঋত কোণ)। এগুলোও বিশেষ বহুব্রীহি এবং 'অন্তরাল' বোঝাতে এরূপ বহুব্রীহি সমাস হয় বলে একে অন্তরালাভিধেয়ক বহুব্রীহি বলা হয়েছে।

(৫) **সরূপোপলক্ষিত বহুব্রীহি** – পরস্পর একপ্রকার (একই) ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বোঝালে সমানাকার (তুল্যাকৃতিবিশিষ্ট) দুটি সপ্তম্যন্ত বা তৃতীয়ান্ত পদের বহুব্রীহি সমাস হয়। এক্ষেত্রে 'ইচ্' প্রত্যয় হয় এবং পূর্বপদের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন– কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তম্ = কেশাকেশি, মুষ্টিভিঃ মুষ্টিভিঃ প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তম্ = মুষ্টিমুষ্টি ইত্যাদি। সরূপাকৃতিবিশিষ্ট (অর্থাৎ তুল্যাকৃতিবিশিষ্ট) দুটি পদের মধ্যে এরূপ বহুব্রীহি হয় বলে একে সরূপোপলক্ষিত বহুব্রীহি বলা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ব্যাকরণগ্রন্থে এই বহুব্রীহি ব্যতিহার বহুব্রীহি নামে স্বীকৃত। 'ব্যতিহার' শব্দের অর্থ পারস্পরিক ক্রিয়াকরণ।

বাংলায়ও 'ব্যতিহার' অর্থে অর্থাৎ পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ বোঝাতে একই বিশেষ্যের দ্বিরুক্তিতে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহ অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসের পূর্বপদের অন্ত্যস্বর সাধারণত 'আ' এবং উত্তরপদের অন্ত্যস্বর সর্বদা 'ই' হয়। যেমন– হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, পরস্পর গালিবর্ষণ করে যে বিবাদ = গালাগালি ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, শুধু যুদ্ধ নয় অন্যান্য অর্থেও অর্থাৎ পরস্পর প্রীতিবিনিময়, আলাপ-পরিচয়, মিলন প্রভৃতি অর্থেও ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যেমন– কানে কানে যে কথা = কানাকানি, কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি, হেসে হেসে যে আলাপ = হাসাহাসি, চোখে চোখে যে দেখা = চোখাচোখি ইত্যাদি। এটাও উল্লেখ্য যে, বাংলায় কখনো কখনো পূর্বপদের পরে যুক্ত 'অ' স্বরটি 'ও' স্বরে রূপান্তরিত হয়। যেমন– চুলোচুলি, ঘুষোঘুষি, খুনোখুনি, গুঁতোগুঁতি, মুখোমুখি ইত্যাদি।

(৬) **সহপূর্বপদ বহুব্রীহি** – তুল্যযোগ (কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে একাধিক পদার্থের যুগপৎ সংযোগ) বোঝালে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে 'সহ' অব্যয়ের বহুব্রীহি সমাস হয়। সমাসে 'সহ' অব্যয়টি পূর্বপদ হয়। 'সহ' অব্যয়ের স্থানে বিকল্পে 'স' আদেশ হয়। যেমন– পুত্রেণ সহ = সপুত্রঃ সহপুত্রঃ বা, অনুজেন সহ = সানুজঃ সহানুজঃ বা ইত্যাদি। সমাসে সহ অব্যয়টি পূর্বপদ হয় বলে এরূপ সমাসকে সহপূর্বপদ বহুব্রীহি বলা হয়েছে। তবে সহার্থে বা তুল্যযোগে এই সমাস হয় বলে অধিকাংশ ব্যাকরণগ্রন্থে এরূপ বহুব্রীহি সহার্থক বা তুল্যযোগে বহুব্রীহি নামে অভিহিত হয়েছে।

বাংলায়ও 'সহ' অর্থবাচক পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সহার্থক বহুব্রীহি সমাস হয় এবং সমাসে সহ স্থানে স হয়। যেমন– বান্ধবের সঙ্গে বর্তমান = সবান্ধব, বিনয়ের সঙ্গে বর্তমান = সবিনয় ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বিভাগগুলো ব্যতীত সমানাধিকরণ-ব্যধিকরণভেদে বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার। অধিকাংশ ব্যাকরণগ্রন্থে বহুব্রীহি সমাসের এই দুই প্রকার শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়।

(১) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** – অন্যপদের অর্থ প্রধান হলে একাধিক প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদের (বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের) যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তা সমানাধিকরণ বহুব্রীহি। প্রথমা ব্যতীত অন্য বিভক্তিযুক্ত অর্থে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। এ সমাসে সমস্যমান পদগুলো বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন বলে তারা একই বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন– পীতম্ অম্বরং যস্য সঃ = পীতাম্বরঃ। উল্লেখ্য যে, কর্মধারয় সমাসও সমানবিভক্তিক এবং সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসও সমানবিভক্তিক অর্থাৎ উভয় বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন পদের যোগে সমাস হয়। এ কারণে ম্যাকডোনেল সমানাধিকরণ বহুব্রীহিকে কর্মধারয় বহুব্রীহি বলেছেন (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭ : ৪৯৪)।

বাংলায়ও অন্যপদার্থের প্রাধান্যে একাধিক প্রথমা বিভক্তিযুক্ত সমানাধিকরণ (বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন) পদের বহুব্রীহি সমাস হয় এবং বিশেষণ পদটি সাধারণত পূর্বপদ হয়। বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– নীল অম্বর যার = নীলাম্বর।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণ পদটি পরপদ হয়। যেমন– মুখ পোড়া যার = মুখপোড়া। কখনো কখনো অন্য বিভক্তির অর্থেও বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– হীরে বসানো যাতে = হীরেবসানো (সপ্তমী বিভক্তির অর্থে), বুক ফাটে যার দ্বারা = বুকফাটা (তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে) ইত্যাদি। বাংলায় প্রথমা বিভক্তির অর্থেও বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– ইঁচড়ে পেকেছে যে = ইঁচড়েপাকা, সমান বয়সী যে = সমবয়সী ইত্যাদি। কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে, এরূপ বহুব্রীহি হচ্ছে সাধারণ বহুব্রীহি (সমানাধিকরণ সমাস নামেও পরিচিত)।

(২) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি** – কোনো কোনো স্থলে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদসমূহ ব্যধিকরণ এবং বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত হয়, এরূপ বহুব্রীহিকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে। যেমন– শূলং পাণৌ যস্য সঃ = শূলপাণিঃ, এখানে শূল ও পাণি ভিন্ন ভিন্ন আধারকে আশ্রয় করে অবস্থান করছে এবং বিগ্রহবাক্যস্থ 'শূলং' পদটি প্রথমা বিভক্তিযুক্ত ও 'পাণৌ' পদটি সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত। অনুরূপ — পদ্মং নাভৌ যস্য সঃ = পদ্মনাভঃ, ধর্মে বৃত্তিঃ যস্য সঃ = ধর্মবৃত্তিঃ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষে সমস্যমান পদগুলো বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত এবং ব্যধিকরণ বহুব্রীহিতেও সমস্যমান পদগুলো বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যাকডোনেল ব্যধিকরণ বহুব্রীহিকে তৎপুরুষ বহুব্রীহি বলেছেন (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭: ৪৯৪)।

বাংলায়ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয় এবং সমস্যমান পদদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ শূন্য বিভক্তিযুক্ত থাকে এবং অন্যটি সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত থাকে। সমাসে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদটি পরপদ হয়। যেমন– চন্দ্র চূড়ায় যার = চন্দ্রচূড়, মধু কণ্ঠে যার = মধুকণ্ঠ ইত্যাদি। তবে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদটি পূর্বপদও হয়। যেমন– পাপে মতি যার = পাপমতি, ধর্মে বুদ্ধি যার = ধর্মবুদ্ধি ইত্যাদি।

সংস্কৃতে সাধারণত ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয় না। বাংলায় কিন্তু ব্যধিকরণ বহুব্রীহির প্রচুর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও বহুব্রীহি সমাসের বিভাগ রয়েছে। যেমন– নঞ্বহুব্রীহি, মধ্যপদলোপী (বা উত্তরপদলোপী) বহুব্রীহি, অব্যয়সমাস বহুব্রীহি ইত্যাদি।

নঞ্বহুব্রীহি – নঞর্থক কোনো অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের বহুব্রীহি সমাস হয়, এরূপ বহুব্রীহিকে নঞ্বহুব্রীহি বলে। যেমন– নাস্তি (নির্) ধনং যস্য সঃ = নির্ধনঃ, নাস্তি আদিঃ যস্য সঃ = অনাদিঃ।

বাংলায় এরূপ সমাসকে নঞর্থক বহুব্রীহি বা নঞ্ বহুব্রীহি বলে (পূর্বে উল্লিখিত)।

মধ্যপদলোপী (বা উত্তরপদলোপী) বহুব্রীহি – বহুব্রীহি সমাসে কোনো কোনো স্থলে মধ্যস্থিত পদের লোপ হয়, এরূপ সমাসকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন– প্রপতিতং পর্ণং যস্য সঃ = প্রপর্ণঃ (প্রপতিতপর্ণঃ বা)। এরূপ ক্ষেত্রে মূলত দুটি সমাস হয় এবং পূর্ববর্তী সমাসের উত্তরপদ লোপ পায়। যেমন– প্রকৃষ্টং (প্র) পতিতম্ = প্রপতিতম্, এখানে 'প্র' উপসর্গের সঙ্গে ধাতুজ ক্রিয়াবাচক 'পতিত' ($\sqrt{}$পত্+ক্ত = পতিত) শব্দের প্রথমে

প্রাদিতৎপুরুষ সমাস হয়েছে। অতঃপর 'প্রপতিত' শব্দের সঙ্গে 'পর্ণ' শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়েছে এবং 'প্রপতিত' এই সমাসবদ্ধ পদের উত্তরপদ 'পতিত' বিকল্পে লোপ পেয়ে 'প্রপর্ণঃ' পদটি গঠিত হয়েছে। এরূপ — বিগতঃ ধবঃ যস্যাঃ সা = বিধবা (বিগতধবা বা)। বিধবা, প্রপর্ণঃ প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ গঠনে যেহেতু প্রথম সমাসের উত্তরপদ লোপ পায় সেহেতু এরূপ সমাসকে উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি বলা উচিত। তবে সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্যস্থ পদটি লোপ পাওয়ায় এরূপ সমাস মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি নামে অভিহিত হয়েছে।

বাংলায়ও ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক পদ লোপ পেয়ে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি হয়। যেমন– গরুড় অঙ্কিত ধ্বজা যার = গরুড়ধ্বজা, রণের দিকে মুখ যার = রণমুখো ইত্যাদি। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসে অধিকাংশ স্থলে উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সমাস হয় বলে তথা ব্যাখ্যামূলক উপমা পদ লোপ পায় বলে একে উপমাত্মক বহুব্রীহিও (উপমান বহুব্রীহি বা ব্যাখ্যামূলক বহুব্রীহিও) বলে। যেমন– গজের মতো আনন (মুখ) যার = গজানন, হাঁড়ির মতো মুখ যার = হাঁড়িমুখো ইত্যাদি। বাংলায় ব্যাসবাক্যের শেষপদ লোপ পেয়েও বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– বিশ গজ দৈর্ঘ্য যার = বিশগজি, গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ ইত্যাদি। এরূপ বহুব্রীহিকে অন্ত্যপদলোপী (বা শেষপদলোপী) বহুব্রীহি বলে। কোনো কোনো বৈয়াকরণ এরূপ বহুব্রীহিকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি হিসেবে গণ্য করেন।

অব্যয়সমাস বহুব্রীহি – 'অব্যয়ানাং চ বহুব্রীহির্বক্তব্যঃ' এই বার্তিক অনুসারে অব্যয় পদেরও বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– উচ্চৈঃ মুখং যস্য সঃ = উচ্চৈর্মুখঃ, অধঃ বদনং যস্যাঃ সা = অধোবদনা ইত্যাদি। এরূপ সমাসকে অব্যয়সমাস বলে। অব্যয়সমাস বহুব্রীহি সমাসের ভেদ, সুতরাং অব্যয়ীভাব থেকে ভিন্ন।

'অনেকমন্যপদার্থে' (পা. ২।২।২৪) সূত্রে 'অনেক' শব্দ থাকায় শুধু দুই নয়, একাধিক যে-কোনো সংখ্যক পদের বহুব্রীহি সমাস হয়। এ কারণে কোনো কোনো বৈয়াকরণ বহুব্রীহি সমাসকে দ্বিপদ-বহুপদভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। যেমন– নীলম্ অম্বরং যস্য সঃ = নীলাম্বরঃ (দ্বিপদ বহুব্রীহি), আরূঢ়াঃ বৃদ্ধাঃ বহবঃ বানরাঃ যম্ = আরূঢ়বৃদ্ধবহুবানরঃ (বহুপদ বহুব্রীহি)। বহুব্রীহি সমাস দ্বিপদত্রিপদচতুষ্পদাদিভেদে বহুবিধ হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, বাংলায় বহুপদী বহুব্রীহি পরিলক্ষিত হয় না।

৪। **দ্বিগু সমাস** – *বাররুচসংগ্রহ* গ্রন্থে একবদ্ভাব এবং অনেকবদ্ভাবভেদে দ্বিগু সমাস দুই প্রকার। যথাক্রমে উদাহরণ — পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ = পঞ্চবটী, দ্ব্যাভ্যাং গোভ্যাং ক্রীতঃ = দ্বিগুঃ। 'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' (পা. ২।১।৫১) সূত্রানুসারে কোনো তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করার প্রয়োজন হলে, কোনো উত্তরপদ পরে থাকলে এবং সমাহার বোঝালে দিগ্বাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের সমানাধিকরণ পদের সঙ্গে কর্মধারয় সমাস হয়। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে সমানাধিকরণ পদের এরূপ কর্মধারয় সমাসকে দ্বিগু সমাস বলে। এই দিক থেকে দ্বিগু সমাস তিন প্রকার — (১) তদ্ধিতার্থ দ্বিগু, (২) উত্তরপদ দ্বিগু[১৪] এবং (৩) সমাহার দ্বিগু[১৫]। যথাক্রমে উদাহরণ — ষণ্ণাং মাতৃণামপত্যং পুমান্ = ষাণ্মাতুরঃ[১৬], পঞ্চ গাবো ধনং যস্য সঃ = পঞ্চগবধনঃ[১৭], অষ্টানাম্ অধ্যায়ানাং সমাহারঃ = অষ্টাধ্যায়ী।

উল্লেখ্য যে, বাংলায় কেবল সমাহার দ্বিগু এই উপবিভাগটি পরিদৃষ্ট হয় (পূর্বে উল্লিখিত)।

৫। **দ্বন্দ্ব সমাস** – 'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' (পা. ২।২।২৯)। 'চার্থে' অর্থাৎ 'চ'-এর অর্থে বর্তমান একাধিক সুবন্ত পদের বিকল্পে সমাস হয়, তার নাম দ্বন্দ্ব। 'চ'-এর অর্থ চার প্রকার। যেমন– (১) সমুচ্চয়, (২) অন্বাচয়, (৩) ইতরেতরযোগ ও (৪) সমাহার। সমুচ্চয় ও অন্বাচয় এই দুই অর্থে দ্বন্দ্ব হয় না, কারণ এই দুই অর্থে বিগ্রহে চ-যুক্ত পদদ্বয়ের মধ্যে সামর্থ্য থাকে না।[১৮] অতএব ইতরেতরযোগ ও সমাহার অর্থেই দ্বন্দ্ব সমাস হয়। এ হিসেবে দ্বন্দ্ব সমাস দুই প্রকার — (১) ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব ও (২) সমাহার দ্বন্দ্ব। এই দুই প্রকার দ্বন্দ্ব আবার দ্বিপদ ও বহুপদভেদে দুই প্রকার। এ হিসেবে দ্বন্দ্ব সমাস চার প্রকার। যেমন– (ক) দ্বিপদ ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব ও (খ) বহুপদ ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব এবং (গ) দ্বিপদ সমাহার দ্বন্দ্ব ও (ঘ) বহুপদ সমাহার দ্বন্দ্ব । যথাক্রমে উদাহরণ — অশ্বশ্চ গজশ্চ = অশ্বগজৌ, যুধিষ্ঠিরশ্চ ভীমশ্চ অর্জুনশ্চ = যুধিষ্ঠিরভীমার্জুনাঃ; হস্তৌ চ পাদৌ চ = হস্তপাদম্, পাণী চ পাদৌ চ শিরশ্চ গ্রীবা চ = পাণিপাদশিরোগ্রীবম্।

বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈয়াকরণগণ দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। বাংলায় সাধারণ দ্বন্দ্ব, মিলনার্থক দ্বন্দ্ব, বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব, বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব, সমার্থক দ্বন্দ্ব, সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব, অলুক দ্বন্দ্ব, একশেষ দ্বন্দ্ব, বহুপদী দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যথাক্রমে উদাহরণ — লতা ও পাতা = লতাপাতা, চা ও বিস্কুট = চাবিস্কুট, দা ও কুমড়া = দাকুমড়া, ছোট ও বড় = ছোটবড়, ভয় ও ডর = ভয়ডর, ভাই ও বোন = ভাইবোন, হাতে ও কলমে = হাতেকলমে, আমি ও তুমি = আমরা, তেল, নুন ও লাকড়ি = তেল-নুন-লাকড়ি, গাছ-গাছালি।

উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতে অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের কোনো দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বাংলায় অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের অনেক দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

একই বিভক্তিযুক্ত একাধিক সমানাকার ও সমার্থক পদের সমন্বয়ে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট থাকলে তাকে একশেষ বলে। দুই পদের একশেষ হলে অবশিষ্ট পদ দ্বিবচনান্ত এবং দুয়ের অধিক পদের একশেষ হলে অবশিষ্ট পদ বহুবচনান্ত হয়। যেমন– নরশ্চ নরশ্চ = নরৌ, নরশ্চ নরশ্চ নরশ্চ = নরাঃ ইত্যাদি। ভিন্নাকার ও ভিন্নার্থক পদসমূহেরও একশেষ হয়। যেমন– বক্রদণ্ডশ্চ কুটিলদণ্ডশ্চ = বক্রদণ্ডৌ কুটিলদণ্ডৌ বা, এখানে পদদ্বয় ভিন্নাকৃতিক কিন্তু সমার্থক। মাতা চ পিতা চ = পিতরৌ, এখানে পদদ্বয় ভিন্নাকৃতিক এবং ভিন্নার্থক। একশেষে সমাসের কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য হয় না। এ কারণে একশেষের সমাসত্ব স্বীকৃত হয় নি। তবে দ্বন্দ্ব ও একশেষ উভয়ই 'চার্থে' হয়ে থাকে অর্থাৎ দ্বন্দ্বের মতো 'চ' যোগে বিগ্রহবাক্য হয় বলে অনেকে একশেষকে এক প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস মনে করেন।

বাংলায় কিন্তু একশেষ দ্বন্দ্ব হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বরূপ সাহা লিখেছেন, "দ্বন্দ্বের 'চ' যোগে ব্যাসবাক্য হয় বলে মনে হয় যেন একশেষ এক প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস। আসলে একশেষ সমাস নয়, এ হচ্ছে সমাসের মত একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি। উক্ত ভুল বশে বাংলা বৈয়াকরণেরা

সাধারণতঃ একশেষকে পৃথগ্‌বৃত্তি স্বীকার না করে একশেষ দ্বন্দ্ব স্বীকার করেন" (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭ : ৫১১)।

একই জাতীয় বা একই ধরনের কোনো কিছু বোঝাতে বাংলায় সহচর, অনুচর, প্রতিচর, বিকার, অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দযোগে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সমাস হয়ে থাকে। যেমন– চুরি-চামারি, ধর-পাকড়, রদ-বদল, হাবু-ডুবু, বাসন-কোসন ইত্যাদি। এরূপ দ্বন্দ্ব সমাসকে ইত্যাদি-অর্থসূচক দ্বন্দ্ব বলে। এরূপ সমাসে সাধারণত পূর্বপদের প্রাধান্য থাকে এবং উত্তরপদটি 'ইত্যাদি, প্রভৃতি, আরো সমগোত্রীয় বা এক জাতীয় বস্তু' এই অর্থ প্রকাশ করে। সংস্কৃতে কিন্তু ইত্যাদি-অর্থসূচক দ্বন্দ্ব এরূপ শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয় না। করুণসিন্ধু দাস লিখেছেন, "ভাষার দাবিতে বাংলা ব্যাকরণ নতুন কিছু সমাসের শ্রেণি নির্ধারণ করে ভালই করেছে। সংস্কৃতে একৈক, দ্বন্দ্ব, ইতরেতর, অন্যোন্য, পরস্পর ইত্যাদি শব্দদ্বৈত সমাস গণ্য হয় নি। সমাসের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য যে এগুলিতে প্রকট তার স্বীকৃতি অবশ্য স্বয়ং পাণিনির *একং বহুব্রীহিবৎ* (পা. ৮।১।৯) সূত্রটি। ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় এগুলি আম্রেড়িতসমাস নামে চিহ্নিত। বাংলায় ব্যাপারটি প্রসারিত হয়েছে নানাভাবে" (করুণাসিন্ধু, ২০০৫ : ১৫১)।

৬। **অব্যয়ীভাব সমাস** – অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদ অব্যয় এবং উত্তরপদ সুবন্ত। কিন্তু কখনো কখনো অব্যয় পূর্বপদ না হয়ে পরপদ হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অব্যয়ীভাব সমাস দুই প্রকার। যেমন– (১) অব্যয়পূর্বপদ অব্যয়ীভাব এবং (২) অব্যয়পরপদ (নামপূর্বপদ) অব্যয়ীভাব। যথাক্রমে উদাহরণ — বনস্য সমীপম্ = উপবনম্, শাকস্য লেশঃ = শাকপ্রতি। কোনো পদই অব্যয় নয় এমন অব্যয়ীভাব সমাসের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। অতএব পূর্বপদ এবং পরপদ অনুসারে অব্যয়ীভাব সমাস তিন প্রকার হতে পারে। যেমন– অব্যয়পূর্বপদ অব্যয়ীভাব, অব্যয়পরপদ (অনব্যয়পূর্বপদ বা) অব্যয়ীভাব, অনব্যয় পূর্বপদ ও পরপদ অব্যয়ীভাব। যথাক্রমে উদাহরণ– গৃহস্য পশ্চাৎ = অনুগৃহম্, সূপস্য লেশঃ = সূপপ্রতি, গঙ্গায়াঃ মধ্যম্ = মধ্যেগঙ্গম্। এছাড়াও নিত্য ও বৈকল্পিকভেদে অব্যয়ীভাব সমাসকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন– (১) নিত্য অব্যয়ীভাব ও (২) বৈকল্পিক অব্যয়ীভাব। যথাক্রমে উদাহরণ – কণ্ঠস্য সমীপম্ = উপকণ্ঠম্, পরি বিষ্ণোঃ = পরিবিষ্ণু। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও অব্যয়ীভাব সমাসকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন– (১) অবিগ্রহ নিত্য অব্যয়ীভাব ও (২) অস্বপদবিগ্রহ নিত্য অব্যয়ীভাব। যথাক্রমে উদাহরণ– অধিহরি, কূলস্য সমীপম্ = উপকূলম্। উল্লেখ্য অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন অধিকাংশ পদই অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।

বাংলায় কিন্তু অব্যয়ীভাব সমাসের কোনো উপবিভাগ পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন সকল পদই নিত্য। মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, "অব্যয়ীভাব-সমাস মাত্রই নিত্য-সমাস" (এনামুল, ২০০৩ : ১৪৬)। বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন সকল পদই অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দৃষ্টিভঙ্গিভেদে সমাসের অনেক প্রকার শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। তাছাড়া একই সমাসের ভিন্ন ভিন্ন রূপও হয়ে থাকে। যেমন,

কুতৎপুরুষে – কুৎসিতঃ পুরুষঃ = কুপুরুষঃ কাপুরুষঃ বা, কুৎসিতঃ অশ্বঃ = কদশ্বঃ, কুৎসিতঃ পন্থাঃ = কাপথম্, কুৎসিতঃ সখা = কিংসখা ইত্যাদি। অন্যান্য সমাসেও সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার কখনো কখনো বিগ্রহবাক্য অনুসারে অর্থাৎ অর্থভেদে একই পদের একাধিক সমাস হয় (পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত)। এ কারণেই সমাসের শ্রেণিবিভাগ করা সহজসাধ্য নয়। অর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী শ্রেণিকরণ দুঃসাধ্য বিবেচনা করে পরিশেষে পাণিনিব্যাকরণে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা হচ্ছে অব্যয়ীভাবাদি প্রতি সমাসের অধিকারে যে সমস্ত সমাস বিহিত হয়েছে সেই সমুদয় সেই সেই সংজ্ঞার লক্ষ্য, অর্থাৎ অব্যয়ীভাবপ্রকরণে বা অব্যয়ীভাব শিরোনামে যে সমস্ত সমাস বিহিত হয়েছে তাদের নাম অব্যয়ীভাব; তৎপুরুষপ্রকরণে বা তৎপুরুষ শিরোনামে যে সমস্ত সমাস বিহিত হয়েছে তাদের নাম তৎপুরুষ; বহুব্রীহিপ্রকরণে বা বহুব্রীহি শিরোনামে যে সমস্ত সমাস বিহিত হয়েছে তাদের নাম বহুব্রীহি; দ্বন্দ্বপ্রকরণে বা দ্বন্দ্ব শিরোনামে যে সমস্ত সমাস বিহিত হয়েছে তাদের নাম দ্বন্দ্ব। তৎপুরুষ সমাসের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য 'ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ' (পা. ২।১।৭২) সূত্রে এমন কিছু সমাসবদ্ধ শব্দ স্বীকার করা হয়েছে, যাদের সরাসরি তৎপুরুষ, এমনকি সমাস বলতে পাঁচবার ভাববার কথা। যেমন– হস্তে গৃহ্য, পাদেগৃহ্য, লাঙ্গলেগৃহ্য, পুনর্দায়, এহিবাণিজা, প্রেহিবাণিজা ইত্যাদি। 'তিষ্ঠদ্‌গুপ্রভৃতীনি চ' (পা. ২।১।১৭) সূত্রেও অব্যয়ীভাব সমাসের এমনি একগুচ্ছ অদ্ভুত শব্দ মেলে। যেমন– তিষ্ঠদ্‌গু, বহুদ্‌গু, আয়তীগবম্, খলেযবম্ ইত্যাদি।

সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও একই সমাসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় এবং অর্থভেদে একই পদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয় (পূর্বেও উল্লিখিত)। তাই বাংলায়ও সমাসের শ্রেণি নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে শব্দের অর্থ ধরে জোড়া শব্দগুলোকে যদি শ্রেণিবদ্ধ করতে হয় তাহলে বাংলা ভাষায় এত শ্রেণি খুঁজে পাওয়া যাবে যে সেগুলোকে কেবল দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব এই পাঁচ প্রকার সমাসে সাজিয়ে কাজ চলবে না, কারণ বাংলায় কেবল দুই পদের সমাস হলেও বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক ও দ্বিরুক্তিমূলক শব্দের প্রবণতা খুব বেশি" (রফিকুল, ২০০১: ৮৬)।

উপর্যুক্ত বিভাগসমূহ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন– লুক্ ও অলুক্ ভেদে সমাস দুই প্রকার। সমাস হলে সমস্তপদটি প্রাতিপদিকত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাতিপদিক হচ্ছে বিভক্তিহীন নামপ্রকৃতি। সমাসবদ্ধ পদ যেহেতু প্রাতিপদিক সেহেতু সমাসের পূর্বে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায়। পরে সমাসবদ্ধ হয়ে একটি নতুন শব্দে (প্রাতিপদিকে) পরিণত হয় এবং বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুসারে সমাসবদ্ধ প্রাতিপদিকের উত্তর নতুন করে বিভক্তি যোগ করে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন– গঙ্গায়াঃ জলম্ = গঙ্গাজলম্, এখানে 'গঙ্গায়াঃ' পদের উত্তর প্রযুক্ত 'ঙস্' (ষষ্ঠীর একবচন) বিভক্তি এবং 'জলম্' পদের উত্তর প্রযুক্ত 'সু' (প্রথমার একবচন) বিভক্তি লোপ পেয়েছে এবং 'গঙ্গা' ও 'জল' শব্দ দুটি সমাসবদ্ধ হয়ে 'গঙ্গাজল' শব্দটি গঠিত হয়েছে। অতঃপর 'সু' বিভক্তি যোগে 'গঙ্গাজলম্' (গঙ্গাজল+সু) পদটি সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কতিপয় সমাসের ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না, বিভক্তিযুক্ত অবস্থায়ই সমাসবদ্ধ হয়।

যেমন– স্তোকাৎ মুক্তঃ = স্তোকান্মুক্তঃ, আত্মনে পদম্ = আত্মনেপদম্ ইত্যাদি। যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় তা লুক্‌সমাস। পক্ষান্তরে যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না, তা অলুক্‌সমাস। সংস্কৃতে অলুক্ তৎপুরুষ ও অলুক্ বহুব্রীহির প্রচুর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। তবে অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাসের কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না এবং অলুক্ অব্যয়ীভাবের দৃষ্টান্ত অতি অল্প দৃষ্ট হয়।

বাংলায়ও লুক্ ও অলুক ভেদে সমাস দুই প্রকার। যেমন– জলে ও স্থলে = জলেস্থলে, কলে ছাটা = কলেছাটা, মুখে মধু যার = মুখেমধু ইত্যাদি। বাংলায় অলুক্ দ্বন্দ্ব, অলুক্ তৎপুরুষ এবং অলুক্ বহুব্রীহি সমাসের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে বাংলায় অলুক্ অব্যয়ীভাব সমাসের কোনো দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। উল্লেখ্য যে, বাংলায় অলুক্ সমাসের ব্যবহার সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশি।

উল্লেখ্য যে, অব্যয়ীভাবাদিবৎ লুক্ ও অলুক্ পৃথক (বা স্বতন্ত্র) কোনো সমাস নয়। অব্যয়ীভাবাদি প্রতিটি সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পাওয়ার কথা। তবে অব্যয়ীভাবাদি প্রতিটি সমাসেই কখনো কখনো পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়েও সমাসবদ্ধ হয়, আর এরূপ সমাসই অলুক্‌সমাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

সমাসের বিশ্লেষণমূলক বাক্য হচ্ছে ব্যসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাসঘটক পদে বিগ্রহ সম্ভব। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে বিগ্রহবাক্য করা সম্ভব হয় না, অথবা বিগ্রহবাক্য করতে হলে অন্যপদের সাহায্য নিতে হয়। অতএব বিগ্রহবাক্যের দিক থেকেও সমাস দুই প্রকার। যেমন– (১) নিত্যসমাস ও (২) অনিত্যসমাস। নিত্যসমাস আবার দুই প্রকার — (ক) অবিগ্রহ নিত্যসমাস এবং (খ) অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।

(ক) **অবিগ্রহ নিত্যসমাস** – যে সমাসের অর্থবোধক বিগ্রহবাক্য হয় না অর্থাৎ যে বিভিন্ন সুবন্ত পদের সমন্বয়ে সমাস হয় সেগুলোর উত্তর অর্থবোধক বিভক্তি যোগ করলেও যদি সমস্তপদের অর্থ বোঝা না যায়, তাহলে তা অবিগ্রহ নিত্যসমাস। যেমন– 'কৃষ্ণসর্পঃ' এই সমস্তপদের বিগ্রহবাক্য সম্ভব নয়। 'কৃষ্ণঃ সর্পঃ'/'কৃষ্ণশ্চাসৌ সর্পশ্চেতি' এরূপ বিগ্রহবাক্য করলে যে-কোনো কালো বর্ণের সাপকে বোঝাবে, কিন্তু 'কৃষ্ণসর্পঃ' এই সমাসবদ্ধ পদের বিবক্ষিত অর্থ হচ্ছে কেউটে সাপ (কালসাপ)। সুতরাং 'কৃষ্ণসর্পঃ' এই সমস্তপদের বিগ্রহবাক্য কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।

(খ) **অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস** – সমস্যমান পদগুলোর দ্বারা যে সমাসের বিগ্রহবাক্য সম্ভব নয়, সমাসের অন্তর্গত সমস্যমান পদের অর্থ প্রকাশকারী পদের দ্বারা (অন্যপদের সাহায্য নিয়ে) বিগ্রহবাক্য করা হয় তাই অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। যেমন– অন্যঃ বৃক্ষঃ = বৃক্ষান্তরম্। এখানে 'বৃক্ষ' শব্দের সঙ্গে অন্যার্থক 'অন্তর' শব্দের সমাস হয়েছে। কিন্তু অন্যার্থ যেহেতু 'অন্তর' শব্দের বাচ্যার্থ নয়, অতএব 'অন্তর' শব্দ দ্বারা বিগ্রহ সম্ভব নয় অর্থাৎ 'অন্তরঃ বৃক্ষঃ' বা 'বৃক্ষস্য অন্তরম্' এরূপ বিগ্রহ সম্ভব নয়। 'অন্তর' শব্দ কোনো শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে 'অন্যার্থ' সূচনা করে, পৃথকভাবে নয়, এজন্যই 'বৃক্ষান্তরম্' এই সমাসবদ্ধ পদের অন্যার্থক 'অন্য' শব্দ আদান করে ('অন্য' শব্দের সাহায্য নিয়ে) বিগ্রহবাক্য করা হয়। অতএব এটা অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।

পাণিনিসম্প্রদায়ের মতে, নিত্যসমাস তিন প্রকার হতে পারে। যেমন–

(১) বিভাষা' (পা. ২।১।১১) এই অধিকার সূত্রের পূর্বে যে সকল সমাস বিহিত হয়েছে সেগুলো নিত্য। যেমন– সাধ্যম্ অনতিক্রম্য = যথাসাধ্যম্, শাকস্য লেশঃ = শাকপ্রতি ইত্যাদি। 'সহসুপা' (পা. ২।১।৪) সূত্রটি 'বিভাষা' সূত্রের পূর্ববর্তী হলেও এর দ্বারা বিহিত সুপ্‌সুপা সমাস কিন্তু নিত্য নয়।

(২) কোনো কোনো স্থলে সূত্রে 'নিত্যম্' পদটি ব্যবহারপূর্বক নিত্যসমাস নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন– নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ' (পা. ২।২।১৭) সূত্র দ্বারা 'উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা' (এক ধরনের খেলা), 'দন্তলেখকঃ' (দন্তচিকিৎসক) ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়েছে। তবে সংজ্ঞা বোঝালেও সমাস নিত্য হয়। 'অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্ (পা. ২।১।২১) সূত্রটি 'বিভাষা' সূত্রের পরবর্তী বলে এখানে সমাস বৈকল্পিক হওয়ার কথা। কিন্তু সংজ্ঞা বোঝায় বলে এই সূত্র দ্বারা বিহিত সমাস নিত্য, বৈকল্পিক নয়। যেমন– উন্মত্তগঙ্গম্ (কোনো দেশের নাম), লোহিতগঙ্গম্ (কোনো দেশের নাম) ইত্যাদি।

(৩) স্থলবিশেষে আবার স্বপদবিগ্রহের অভাবহেতু সমাস নিত্য হয়। যেমন– শোভনঃ রাজা = সুরাজা, দ্বিজায় ইদম্ = **দ্বিজার্থং** পয়ঃ, ব্রাহ্মণায় অয়ম্ = **ব্রাহ্মণার্থঃ** সূপঃ, দেবায় ইয়ম্ = **দেবার্থা** মালা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, অব্যয়ীভাবাদিবৎ নিত্যসমাস একটি স্বতন্ত্র বা পৃথক সমাস নয়। অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসের ব্যাসবাক্য না হলে অথবা সমাসঘটক পদে ব্যাসবাক্য না হলে (পদান্তরের সাহায্যে ব্যাসবাক্য হলে) তা নিত্যসমাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যেমন– গৃহস্য পশ্চাৎ = অনুগৃহম্ (অব্যয়ীভাব); খট্টারূঢ়ঃ (তৎপুরুষ); কৃষ্ণসর্পঃ (কর্মধারয়); সুন্দরী জায়া যস্য সঃ = সুন্দরজানিঃ (বহুব্রীহি)।

২। **অনিত্যসমাস** – যেখানে সমস্যমান পদের দ্বারা বিগ্রহ স্বাভাবিক এবং বিগ্রহবাক্যের দ্বারা সমাসবদ্ধ পদের অর্থ বোঝা যায় তা অনিত্যসমাস। 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই বিগ্রহবাক্যের দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, 'রাজপুরুষঃ' এই সমস্তপদের দ্বারাও সেই অর্থের বোধ হয়। কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত অধিকাংশ সমাসই অনিত্য।

বাংলায়ও নিত্য ও অনিত্য ভেদে সমাস দুই প্রকার। বাংলায়ও অব্যয়ীভাবাদিবৎ নিত্য সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মতে, "নিত্যসমাস কোনও নির্দিষ্ট সমাস নহে। যে কোনও সমাস, যাহার রীতিমত ব্যাসবাক্য নাই, নিত্য সমাস হইতে পারে" (শহীদুল্লাহ্, ১৩৮৩ : ১৩৩)। যেমন– মিলের অভাব = গরমিল (অব্যয়ীভাব), ঘর ছেড়েছে যে = ঘরছাড়া (তৎপুরুষ), কাঁচকলা (কর্মধারয়) ইত্যাদি। বাংলায়ও অধিকাংশ সমাস হচ্ছে অনিত্য।

অন্যভাবেও সমাসকে বিভক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে, বিগ্রহবাক্যের দিক থেকে সমাস তিন প্রকার। গুরুপদ হালদার লিখেছেন, "ক্বচিন্নিত্যঃ ক্বচিদ্বিকল্পঃ ক্বচিন্ন স্যাৎ" (গুরুপদ, ১৩৫০ : ১৯০)। অর্থাৎ সমাস কোথায়ও নিত্য,

কোথায়ও বৈকল্পিক, কোথায়ওবা হয় না।

(১) **ক্বচিন্নিত্যঃ** – কৃষ্ণসর্পঃ, গ্রামান্তরম্ ইত্যাদি।

(২) **ক্বচিদ্বিকল্পঃ** – যেখানে বিগ্রহ ও সমাস দুই সম্ভব, দুই স্বাভাবিক, সেখানে সমাস বৈকল্পিক। যেমন– বিদ্যয়া হীনাঃ = বিদ্যাহীনাঃ, ভীমশ্চ অর্জুনশ্চ = ভীমার্জুনৌ, মহান্ বীরঃ = মহাবীরঃ ইত্যাদি।

(৩) **ক্বচিন্ন** – কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিগ্রহ স্বাভাবিক, কিন্তু সমাস হয় না। যেমন– 'রামো জামদগ্ন্যঃ'।

অন্য প্রণালীতেও সমাসকে ভাগ করা হয়; যেমন– (১) পদপ্রাধান্যভেদে (অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ বা ষড়্বিধ), (২) সুবলুগ্‌ভেদে (লুক্ ও অলুক্) এবং (৩) সম্ভবদ্বিগ্রহবাক্যভেদে (নিত্য ও অনিত্য) সমাস তিন প্রকার।

অন্য আর একটি দিক থেকেও সমাসের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে, যেমন– (১) দুই পদের সমাস এবং (২) দুয়ের অধিক পদের সমাস।

(১) **দুই পদের সমাস** – সাধারণত দুই পদের সমন্বয়ে সমাস হয়। যেমন– শরণম্ আপন্নঃ = শরণাপন্নঃ, পিতা চ পুত্রশ্চ = পিতাপুত্রৌ ইত্যাদি। অধিকাংশ সমাসবদ্ধ পদই দুই পদের সমন্বয়ে গঠিত ।

(২) **দুয়ের অধিক পদের সমাস** – 'অনেক' শব্দের অর্থ একাধিক, একাধিক বললে কেবল দুই নয়, দুয়ের অধিক সংখ্যাও বোঝায়। এ কারণে 'অনেকমন্যপদার্থে' (পা. ২।২।২৪) সূত্রানুসারে দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়েও বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– মত্তাঃ বহবঃ মাতঙ্গা যস্মিন্ (বনম্) = মত্তবহুমাতঙ্গম্, আরূঢ়াঃ বৃদ্ধাঃ বহবঃ বানরাঃ যম্ (বৃক্ষঃ) = আরূঢ়বৃদ্ধবহুবানরঃ ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব সমাসেও 'অনেকমন্যপদার্থে' সূত্র থেকে 'অনেকম্' পদের অনুবৃত্তি হয়, এর ফলে দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়ে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন – হেমন্তশ্চ শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ = হেমন্তশিশিরবসন্তাঃ, রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ ভরতশ্চ শত্রুঘ্নশ্চ = রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নাঃ, শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চ গন্ধশ্চ = শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ ইত্যাদি। 'উত্তরপদেন পরিমাণিনা দ্বিগোঃ সিদ্ধয়ে বহূনাং তৎপুরুষস্যোপসংখ্যানম্' (বার্তিক) অর্থাৎ পরিমেয় কোনো পদ যদি উত্তরপদ হয়, তবে এই উত্তরপদের সঙ্গে (পূর্বস্থ পদদ্বয়ের যুগপৎ) দ্বিগু সমাস সিদ্ধ করতে হলে বহুপদের (অর্থাৎ দুয়ের অধিক পদের) তৎপুরুষ সমাস স্বীকর্তব্য। যেমন– দ্বে অহনী জাতস্য = দ্ব্যহ্নজাতঃ। এখানে তদ্ধিতার্থে দ্বিগু সমাসনিষ্পন্ন 'দ্ব্যহ্ন' (দ্বি + অহন্) শব্দের সঙ্গে পরিমেয় 'জাত' শব্দের যুগপৎ তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। দ্বিগুও যেহেতু তৎপুরুষ এবং দ্বিগু ও তৎপুরুষ যেহেতু যুগপৎ সংঘটিত হয়, অতএব 'দ্ব্যহ্নজাতঃ' পদটি ত্রিপদ তৎপুরুষ। তৎপুরুষ সমাসের এরূপ প্রয়োগ দুর্লভ। উল্লেখ্য যে, অব্যয়ীভাব সমাস কেবল দুই পদের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

বাংলায় সাধারণত দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়ে সমাস হয় না। তবে সংস্কৃতের অনুসরণে কখনো কখনো দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়ে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন– পশু-পাখি-

কীট-পতঙ্গ, নাচ-গান-বাজনা, টক-ঝাল-মিষ্টি ইত্যাদি। সুনীতিকুমার (১৯৯৫) চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস সাধারণত সমাসবদ্ধ না করে পৃথক শব্দরূপে লিখিত হয়। যেমন– নাক কান গলা; পাইক পেয়াদা সিপাই শান্ত্রী; ইট কাঠ চুন সুরকি ইত্যাদি। একাধিক সমাসবদ্ধ শব্দের মিলনেও বহুপদময় সমাস গঠিত হয়। যেমন– নয় জ্ঞাত = অজ্ঞাত (নঞতৎপুরুষ), কুল ও শীল = কুলশীল (দ্বন্দ্ব)। এবার 'অজ্ঞাত' ও 'কুলশীল' এই সমাসবদ্ধ পদ দুটির মিলনে গঠিত বহুপদময় সমাস: অজ্ঞাত কুলশীল যার = অজ্ঞাতকুলশীল (বহুব্রীহি)। আবার কখনো কখনো প্রথমে একটি সমাস হয় এবং পরে ঐ সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে অন্য পদের সমন্বয়ে অন্য আর একটি সমাস হয়। যেমন– নব যে পল্লব = নবপল্লব (কর্মধারয়), নবপল্লবের শোভা = নবপল্লবশোভা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ, মতান্তরে সম্বন্ধ তৎপুরুষ)।

দুয়ের অধিক পদের সমাসে একাধিক সমাসের নিয়ম কাজ করে। এ কারণে একাধিক সমাসের সমন্বয়ে গঠিত সমাসকে মিশ্র সমাস বলে। জ্যোতিভূষণ চাকী লিখেছেন, "অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় পদে একাধিক সমাস নিষ্পন্ন পদ যুক্ত থাকে, তখন সেই পদগুলির দ্বারা নিষ্পন্ন সমাসকে মিশ্র সমাস বলে" (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ১৩৮)। মিশ্র সমাসকে পদগর্ভ সমাসও বলা হয়। যেমন, ঋষিদাস লিখেছেন, "কখনো কখনো বিভিন্ন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা একটি সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ গঠন করা হয় — ইহাকে মিশ্রসমাস বা পদগর্ভ সমাস বলে" (ঋষিদাস, ১৯৮১ : ১৫১)। তবে কোনো কোনো বৈয়াকরণ পদগর্ভ সমাসকে পৃথক সমাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, অজিতকুমার গুহ ও আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত কতিপয় দীর্ঘ সমাসকে অন্য কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় কেউ কেউ সেগুলোকে পদগর্ভ সমাস বলে।" (অজিত, ১৯৯৭ : ৯১)। উল্লেখ্য যে, বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কিন্তু মিশ্রসমাস নয়। এক্ষেত্রে জ্যোতিভূষণ চাকীর মত উদ্ধারযোগ্য : "জীবন যৌবন ধন মান পদবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাস না করে পৃথক পৃথকভাবে পদগুলি লিখেছেন। সমাস করলে তা দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে পড়ত, মিশ্রসমাস নয়; হীরামুক্তামাণিক্যও মিশ্রসমাস নয়, — এখানেও শুধু দ্বন্দ্ব" (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ১৩৮)। স্মরণীয় যে, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসের ন্যায় মিশ্রসমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়, এটা বিভিন্ন সমাসের মিশ্রণ। বর্তমানে বাংলা ভাষায় মিশ্রসমাস তথা বহুপদময় সমাসের প্রচলন বা ব্যবহার নেই বললেই চলে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মিশ্রসমাস বা বহুপদময় সমাসের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

ম্যাকডোলেন ক্রিয়াপদের সমাস (গতিতৎপুরুষ) এবং নামপদের সমাস ভেদে সমাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭ : ৪৪১)। তাঁর মতে, নামপদের সমাস প্রধানত পাঁচ প্রকার। যেমন– কেবলসমাস (সুপ্‌সুপা সমাস), অব্যয়ীভাব, সম্বন্ধাবচ্ছেদক (তৎপুরুষ), বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব।

উপর্যুক্ত শ্রেণিগুলো ছাড়া বাংলায় আরো কিছু শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

(১) **অসংলগ্ন সমাস :** সমাসে সমস্যমান পদগুলোর সংলগ্ন বা যুক্ত থাকার কথা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার্থে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। বহুপদময় সমাসে

সমস্যমান পদগুলো যুক্ত থাকলে সমস্তপদটি দীর্ঘ হয়। কখনো কখনো সমাসবদ্ধ পদটির অর্থ বুঝতেও অসুবিধা হয়। তাই অনেক সময় বহুপদময় সমাসের ক্ষেত্রে সমস্যমান পদগুলোকে বা সমস্তপদগুলোকে সংলগ্ন বা যুক্ত করে না লিখে বিচ্ছিন্নভাবে (পৃথক পৃথক পদ বা শব্দরূপে) লেখা হয়। সংযোগ-চিহ্নও ব্যবহার করা হয় না। আবার কোনো সংস্থা বা সম্মেলনাদির নাম মূলত সমাসবদ্ধ হলেও সমস্যমান পদগুলো বিযুক্তভাবে লেখা হয়। আবার কখনো কখনো অলুক সমাসেও সমস্যমান পদুগলো বিচ্ছিন্ন থাকে। এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত সমাসকে অসংলগ্ন সমাস (বা অযুক্ত সমাস) বলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "যে সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদগুলি একত্রবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হয়, তাকে অসংলগ্ন সমাস বলে" (সুনীতিকুমার, ২০০১: ১৩৮)। যেমন– বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অনুভব বহুমুখী সমবায় সমিতি ইত্যাদি।

সংস্কৃতে সাধারণত অসংলগ্ন সমাস দেখা যায় না।

(২) **বাক্যাংশ সমাস (বা বাক্যমূলক সমাস) :** বাংলায় কখনো কখনো বাক্যের অংশবিশেষও একপদরূপে গৃহীত হয়। এরূপ একপদরূপে গৃহীত সমাসকে বাক্যাংশ সমাস বলে। পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সম্বোধনপদ ও ক্রিয়াপদের একীকরণে এবং বাক্যের অংশকে একপদরূপে গ্রহণ করে বাঙলায় একধরনের সমাস নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, যাদের প্রচলিত কোন সমাসের আওতায় আনা যায় না — এদের 'বাক্যাংশ সমাস' নামে অভিহিত করা চলে" (পরেশচন্দ্র, ১৯৮৯: ২৩৭)। উল্লেখ্য যে, সম্বোধনপদ ও ক্রিয়াপদের সমন্বয়ে অথবা শুধু একাধিক সম্বোধনপদে গঠিত সমস্তপদ সাধারণত বাংলায় ব্যক্তিনামরূপেই ব্যবহৃত হয়। বাক্যাংশ সমাস নিম্নোক্তরূপে গঠিত হয় —

(ক) **প্রথম পদ অনুজ্ঞা এবং দ্বিতীয় পদ সম্বোধন :** রাখহরি, ভজহরি, জয়গোপাল ইত্যাদি।
(খ) **প্রথম পদ নিষেধসূচক অব্যয় এবং দ্বিতীয় পদ সম্বোধন :** আন্নাকালী (আর-না-কালী)।
(গ) **উভয় পদই সম্বোধন :** হরেকৃষ্ণ, হরেরাম, রাধেশ্যাম ইত্যাদি।
(ঘ) **বিবিধ :** যাচ্ছেতাই (যা ইচ্ছা তাই), নাস্তানাবুদ (ন অস্ত্র ন বুদ), পেছনে-ফেলে-আসা-দিনগুলো ইত্যাদি।

(৩) **ছদ্মবেশী সমাস:** ধ্বনিগত রূপান্তরের ফলে অনেক সমাসবদ্ধ পদকে সমাসবদ্ধ পদ বলে মনে হয় না। যেমন– কর্ম করে যে = কর্মকার > কামার, কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার > কুমার/কুমোর। এরূপ — ভ্রাতৃশ্বশুর > ভাশুর, বাসগৃহ > বাসর ইত্যাদি। এসব শব্দ মূলত সমাসবদ্ধ, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। এগুলো ছদ্মবেশী সমাস। মুহাঃ মনসূর উর রহমান লিখেছেন, "ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে মূল সমাসবদ্ধ পদের পরিবর্তন ঘটলে তাকে ছদ্মবেশী সমাস বলা হয়" (মনসূর, ২০০৫ : ৪০৩)।

উপর্যুক্ত শ্রেণিবিভাগসমূহ ছাড়াও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সুকুমার সেনের মতে, 'শব্দার্থ ও ব্যাকরণের দিক দিয়ে তদ্ভব বাংলা সমাস আট প্রকার; যেমন– (১) তৎপুরুষ, (২) কর্মধারয়, (৩) বহুব্রীহি, (৪) ব্যতিহার, (৫) দ্বিগু, (৬) দ্বন্দ্ব, (৭) অব্যয়ীভাব এবং (৮) ক্রিয়াসমভিব্যাহার (যৌগপদ্য)।' প্রথম

সাতটি শ্রেণি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিয়াসমভিব্যাহার (যৌগপদ্য) হচ্ছে একই সঙ্গে দুটি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া অর্থে দুটি ক্রিয়াপদের সমাস; যেমন– ওঠবস, মারধর ইত্যাদি। এগুলো মূলত পূর্বোক্ত দুটি ক্রিয়াপদে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস।

উপসংহার

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলা ব্যাকরণ অনেকাংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুগামী। তবে কালের বিবর্তনে এবং বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে বাংলা ভাষা এবং বাংলা ব্যাকরণের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে এবং ঘটছে। বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কারণে সংস্কৃত ও বাংলা সমাসের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হচ্ছে। সমাসের শ্রেণিবিভাগে সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও সাদৃশ্যই বেশি রয়েছে। সংস্কৃতে যে সকল সমাস প্রচলিত আছে তাদের প্রায় সবকটি সমাস বাংলায়ও প্রচলিত আছে। তবে বাংলা সমাসের কিছু নতুন শ্রেণিবিভাগও উল্লিখিত হয়েছে।

কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সমাসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বৈয়াকরণগণও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণপূর্বক সংস্কৃত ও বাংলা সমাসের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। অর্থাৎ এক এক বৈয়াকরণ এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃত ও বাংলা সমাসের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করা হলেও পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ (মতান্তরে ষড়্‌বিধ) শ্রেণিবিভাগই অধিকাংশ বৈয়াকরণ গ্রহণ করেছেন। কেননা অর্থ অনুসারেই সমস্তপদের সমাস নির্ধারিত হয়। বক্তার ইচ্ছা অনুসারে একই পদ নানা ব্যঞ্জনায় রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারণে একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। এই অর্থগত ভিন্নতার কারণে একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয় এবং তদনুসারেই ব্যাসবাক্য হয়। ব্যাসবাক্য অনুসারেই সমাসের নাম নির্ধারিত হয়। 'ইন্দ্রশত্রুঃ' একটি সমস্তপদ, এর একাধিক অর্থ হতে পারে এবং অর্থগত পার্থক্যে পদটিতে একাধিক সমাসও সাব্যস্ত হতে পারে। যেমন– ইন্দ্রঃ শত্রুঃ যস্য সঃ = ইন্দ্রশত্রুঃ, ইন্দ্রস্য শত্রুঃ = ইন্দ্রশত্রুঃ। এই দুটি ক্ষেত্রেই সমস্তপদের আকৃতি বা গঠন এক এবং দুটি ক্ষেত্রেই পূর্বপদ ও পরপদ সুবন্ত। গঠনগত বা আকৃতিগত দিক থেকে সমস্তপদ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ক্ষেত্রেই একই শ্রেণির সমাস ('সুবন্তের সঙ্গে সুবন্তের সমাস') হয়েছে। কিন্তু অর্থগত পার্থক্যে দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুটি সমাস হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে অন্যপদার্থের প্রাধান্যহেতু বহুব্রীহি সমাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উত্তরপদার্থের প্রাধান্যহেতু তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। এরূপ অনেক পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়।

বাংলায়ও একই পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়। যেমন– যিনি পণ্ডিত তিনিই মূর্খ/ পণ্ডিত (জ্ঞানে) অথচ মূর্খ (ব্যবহারে) = পণ্ডিতমূর্খ এবং পণ্ডিত ও মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ। এই দুটি ক্ষেত্রেই সমস্তপদের আকৃতি বা গঠন এক এবং দুটি ক্ষেত্রেই পূর্বপদ ও পরপদ

উভয়ই বিশেষণ। আকৃতিগত বা গঠনগত দিক থেকে পদদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আকৃতিগত বা গঠনগত দিক থেকে ক্ষেত্রদ্বয়ে একই শ্রেণির সমাস ('বিশেষণের সঙ্গে বিশেষণের সমাস') হয়েছে। কিন্তু অর্থগত পার্থক্যের কারণে দুটি ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদে একই ব্যক্তিকে বোঝানোর কারণে কর্মধারয় সমাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝানোর কারণে, অর্থাৎ উভয়পদের অর্থের প্রাধান্যহেতু দ্বন্দ্ব সমাস হয়েছে। এরূপ অনেক পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়। এ কারণে সমাসসাধনে পদের অর্থের দিকে লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

'সুবন্তের সঙ্গে সুবন্তের সমাস' ("সুপাং সুপা.....") ইত্যাদি শ্রেণিবিভাগ এবং 'বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস' ইত্যাদি শ্রেণিবিভাগ সমাসের বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ, আকৃতিগত বা গঠনগত দিক মাত্র। এরূপ শ্রেণিবিভাগে সমাসের অর্থগত তথা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগ সমাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এরূপ শ্রেণিবিভাগেই সমাসের অন্তঃস্বরূপটি ধরা পড়ে। তবে সংস্কৃতে পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব প্রতিটি সমাসেই ব্যতিক্রম, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ রয়েছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিচারে এরূপ শ্রেণিবিভাগ সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তুলনামূলকবিচারে পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত এই চতুর্বিধ শ্রেণিবিভাগই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

সংস্কৃতে সমাসান্ত, স্বরনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে সমজাতীয়তার পরিচয় দিতে হলে অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগের আবশ্যকতা অপরিহার্য। অব্যয়ীভাবাদি প্রতিটি সমাসেরই নিজস্ব কতিপয় সমাসান্ত প্রত্যয় রয়েছে যেগুলো তত্তৎসমাসের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিহিত হয়, সর্বত্র নয়। তৎপুরুষ সমাসের স্বর একরূপ, অন্য সমাসের অন্যরূপ। সমাসের স্বরপার্থক্য বহিরাকৃতি দেখে বোঝা যায় না। স্বরপার্থক্য বুঝতে হলে পদার্থগত প্রাধান্যে অব্যয়ীভাবাদি পৃথক জাতি নির্ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মূল কথা হচ্ছে, সম-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সংক্ষেপে দিতে হলে এবং সমাসের স্বর নির্ণয় করতে হলে অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণিবিভাগ একান্ত প্রয়োজন। তবে অন্যান্য শ্রেণীবিভাগও উপেক্ষণীয় নয়। সংস্কৃত ও বাংলা সমাসের কোনো কোনো শ্রেণিবিভাগ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু কোনো শ্রেণিবিভাগই অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর নয়। সংস্কৃত ও বাংলা সমাসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তথা সমাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য সকল প্রকার শ্রেণিবিভাগই জ্ঞাতব্য বা গ্রহণীয়।

সমাসগঠনের মূল ভিত্তি যেহেতু দুটি পদ, সেহেতু অর্থগত প্রাধান্যের দিক থেকে সমাস অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব এই চার প্রকারের অধিকভাগে বিভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এতৎসত্ত্বেও কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে, কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস। এ হিসেবে সমাস ছয় প্রকার। তবে ভট্টোজিদীক্ষিতসহ অধিকাংশ বৈয়াকরণের মতে, সংস্কৃতে পদার্থের প্রাধান্যবিচারে কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস নয়। কর্মধারয় তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্বিভাগ মাত্র এবং দ্বিগু সমাস এক প্রকার কর্মধারয় ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অতএব পদার্থের প্রাধান্যবিচারে সমাস চার প্রকার। নিত্য ও অনিত্য, লুক্ ও অলুক্ প্রভৃতি

অন্যান্য শ্রেণিবিভাগ এই চার প্রকার সমাসের অন্তর্গত। তবে সংস্কৃতে এই চতুর্বিধ সমাসের বহির্ভূত সুপ্‌সুপা সমাস নামে আর এক শ্রেণির সমাসের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অতএব সুপ্‌সুপা সমাসসহ সংস্কৃতে সমাস পাঁচ প্রকার।

বাংলায়ও পদার্থের প্রাধান্যবিচারে সমাস অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব এই চার প্রকার। তবে বাংলায় অধিকাংশ বৈয়াকরণের মতে, কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস। এ হিসেবে সমাস ছয় প্রকার এবং নিত্য ও অনিত্য, লুক্ ও অলুক্ প্রভৃতি শ্রেণিবিভাগও এই ছয় প্রকার সমাসের অন্তর্গত।

আগেই বলেছি, সমাসগঠনের মূল ভিত্তি দুটি পদ। এতৎসত্ত্বেও সংস্কৃতে দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত সমস্তপদের অভাব নেই। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রতিটি সাহিত্যকর্মেই বহুপদী সমাসের প্রচুর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে বাংলায় দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত সমাসের প্রয়োগ সাধারণত দৃষ্ট হয় না। তবে দুয়ের অধিক পদের মিলনে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের কিছু দৃষ্টান্ত বাংলায় দৃষ্ট হয়, বিশেষ করে সাধু ভাষায় (তৎসম শব্দে) বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাসের অনেক দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

বাংলার তুলনায় সংস্কৃতে অনেক ক্ষেত্রে সমাসের শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণ করা সহজতর। কেননা সংস্কৃতে অনেক ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ শব্দের রূপ দেখেই অনুমান করা যায় শব্দটি কোন সমাসনিষ্পন্ন। যেমন– 'নীলাম্বরম্' এই সমাসবদ্ধ পদটি দেখেই অনুমান করা যায় যে, পদটি কর্মধারয় (তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত) সমাসনিষ্পন্ন। কেননা এক্ষেত্রে উত্তরপদরূপে প্রযুক্ত 'অম্বর' শব্দের লিঙ্গ অনুসারে পদটি ক্লীবলিঙ্গ হয়েছে (তৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন শব্দ পরপদের লিঙ্গ অনুসারে লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়)। আবার 'নীলাম্বরঃ' পদটি দেখেই অনুমান করা যায় যে, পদটি কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন নয়। কেননা এক্ষেত্রে সমস্তপদটি ক্লীবলিঙ্গ না হয়ে পুংলিঙ্গ হয়েছে। এক্ষেত্রে বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় সমাসনিষ্পন্ন পদে নীলবস্ত্র পরিধানকারী ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে এবং তার লিঙ্গ অনুসারে পদটি পুংলিঙ্গ হয়েছে। সুতরাং সংস্কৃতে যেহেতু লিঙ্গ ও বচন অনুসারে সমাসনিষ্পন্ন শব্দ রূপ পরিগ্রহ করে সেহেতু অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব সমাসের গঠনপ্রণালীসংক্রান্ত নিয়মাবলি জানা থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ পদের রূপ দেখেই অনুমান করা যায় শব্দটি কোন সমাসনিষ্পন্ন। তবে যেসব ক্ষেত্রে একই পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয় সেসব ক্ষেত্রে রূপ দেখেই পদটি কোন সমাসনিষ্পন্ন তা অনুমান করা যায় না, অর্থ অনুসারেই সমাস নির্ধারিত হয়।

বাংলায় যেহেতু লিঙ্গ ও বচন অনুসারে সমাসনিষ্পন্ন শব্দের কোনো রূপান্তর হয় না, সেহেতু ব্যাসবাক্যে বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত কোন শব্দ কোন সমাসনিষ্পন্ন তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান করা যায় না। আর যেসব ক্ষেত্রে একই পদে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয় সেসব ক্ষেত্রে তো সম্ভবই নয়। যেমন– নীল যে অম্বর = নীলাম্বর (কর্মধারয়) এবং নীল অম্বর যার = নীলাম্বর (বহুব্রীহি)। দুটি ক্ষেত্রেই সমাসনিষ্পন্ন শব্দের রূপ 'নীলাম্বর'। সুতরাং এক্ষেত্রে রূপ দেখে সমাস নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ব্যাসবাক্য করার পরেই বলা সম্ভব কোন সমাস হয়েছে। তবে বাংলায়ও অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি

এবং দ্বন্দ্ব সমাসের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা থাকলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রূপ দেখেই শব্দটি কোন সমাসনিষ্পন্ন (তা অনুমান করা যায়)। যেমন– উপশহর, প্রতিহিংসা, ফি-বছর প্রভৃতি সমাসনিষ্পন্ন শব্দ দেখেই অনুমান করা যায় যে, শব্দগুলো অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন। কেননা বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পূর্বপদরূপে প্রযুক্ত হয় (তবে বাংলায়ও অব্যয়ীভাব সমাসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যয় পরপদ হয়। যেমন– জনপ্রতি, মণপ্রতি ইত্যাদি)।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আকৃতি দেখে সংস্কৃত ও বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাস সম্পর্কে অনুমান করা গেলেও পদার্থের প্রাধান্যবিচারই হচ্ছে সমাস নির্ধারণের উৎকৃষ্ট পন্থা।

টীকা

১. সমাসে একাধিক পদের একপদ হয়ে ওঠার অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য মনে রেখে পাণিনির পরবর্তী কোনো বৈয়াকরণ সমাসের এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

২. বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান কোনো পদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকে না বিধায় কোনো কোনো বৈয়াকরণ একে 'সর্বপদার্থাপ্রাধান' (সর্বপদার্থের অপ্রধান) সমাস বলেন।

৩. 'তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ' (পা. ১।২।৪২) অর্থাৎ যে তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদগুলো (পদদ্বয়) সমানাধিকরণ অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন বা অভেদ সম্বন্ধে একার্থ প্রতিপাদক হয় অর্থাৎ একই বিভক্তিযুক্ত থাকে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন– মধুরং বচনম্ = মধুরবচনম্, মহান্ দেবঃ = মহাদেবঃ ইত্যাদি।

৪. সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুঃ' (পা. ২।১।৫২) অর্থাৎ যে কর্মধারয় সমাসে সংখ্যাবাচক পদ পূর্বে থাকে, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন– পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ = পঞ্চবটী, চতুর্ণাং যুগানাং সমাহারঃ = চতুর্যুগম্ ইত্যাদি।

৫. "পূর্বমধ্যান্ত্যসর্বান্য-পদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ।
প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ ॥" (গুরুপদ, ১৩৫০ : ১৯২)
বাভট একজন প্রাচীন আচার্য। তাঁর *শাস্ত্রদর্পণনিঘণ্টু* একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অমরকোষোদ্‌ঘাটনে ক্ষীরস্বামী এবং রসবতীতে জুমরনন্দী বাভটের নাম উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাকরণের উপর বাভটের কোনো গ্রন্থ এবং তৎসংক্রান্ত একটি সম্প্রদায় পূর্বে অবশ্যই বিদ্যমান ছিল (কিন্তু বর্তমানে বিলুপ্ত)। বাভটের কাল একাদশ-দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দ।

৬. এ স্থলে মধ্যস্থিত নঞ্-এর অভাববোধক অর্থই প্রধান।

৭. ভট্টোজিদীক্ষিত পাণিনির পরবর্তী বৈয়াকরণ। তিনি *বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী* নামক ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন।

৮. পা. = পাণিনি, *অষ্টাধ্যায়ী* বোধ্য। পাণিনির সূত্রের ক্ষেত্রে এই সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে।

৯. কর্মণ্যণ্' (পা. ৩।২।১) এই সূত্রবিহিত অণ্ প ্রত্যয়ান্ত 'কুম্ভকার' শব্দে 'উপপদমতিঙ্' (পা. ২।২।১৯) সূত্র ও গতিকারকোপপদানাং কৃদ্ভিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক্সুবুৎপত্তেঃ' এই পরিভাষা অনুসারে 'কুম্ভস্য' এই সুবন্ত পদের সঙ্গে 'কার' (কৃ+অণ্) এই নামের (প্রাতিপদিকের) সমাস হয়েছে এবং সমাস হওয়ার পর 'কুম্ভকার' শব্দে 'সুপ্' প্রাপ্তি ঘটেছে। যেমন– কুম্ভকার + সু = কুম্ভকারঃ।

১০. নঞর্থক অব্যয়ের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণের যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্তৎপুরুষ সমাস বলে।

১১. 'নঞ্' অর্থবোধক অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি বা নঞ্ বহুব্রীহি বলে।

১২. 'চৌচালা ঘর' বাক্যে 'চৌচালা' পদটি ঘরের বিশেষণ। এরূপ বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ যেহেতু দ্বিগু সমাসের ন্যায় সংখ্যাবাচক শব্দ, সেহেতু ডক্টর মুহম্মদ এনামুল (২০০৩) হক এ সমাসকে দ্বিগু-বহুব্রীহি বলেছেন।

১৩. "তত্রাষ্টধা তৎপুরুষঃ ষড়্বিধঃ কর্মধারয়ঃ।
ষড়্বিধশ্চ বহুব্রীহির্দ্বিগুরাভাষিতো দ্বিধা ॥
দ্বন্দ্বশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়োঽব্যয়ীভাবো দ্বিধা মতঃ।" (গুরুপদ, ১৩৫০: ১৯৭)

১৪. বহুব্রীহি সমাস করতে গিয়ে উত্তরপদ পরে থাকাকালীন অবস্থায় পূর্ববর্তী দুটি পদে যে দ্বিগু সমাস হয় তা উত্তরপদ দ্বিগু। সংজ্ঞার্থ না বোঝালে দিগ্বাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয় এবং এক্ষেত্রে পরে অন্য একটি পদ বসিয়ে তার সঙ্গেও সমাস করতে হয়, এরূপ সমাস হচ্ছে উত্তরপদ দ্বিগু।

১৫. সংজ্ঞার্থ না বোঝালে সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সমানাধিকরণ পদের সঙ্গে তৎপুরুষ (কর্মধারয়) সমাস হয় এবং এরূপ তৎপুরুষ (কর্মধারয়) সমাস হচ্ছে সমাহার দ্বিগু। সমাহার বলতে একাধিক পদার্থের একত্রীকরণ (এক সঙ্গে গ্রহণ) বোঝায়। সমাহার দ্বিগু সমাসে সমস্তপদটি একবচনান্ত হয়।

১৬. ষণ্ণাতৃ+অণ্ > ষণ্ণাতু+ অণ্ > ষণ্ণাতু+র+ অণ্ > ষাণ্ণাতুর্+অ > ষাণ্ণাতুর+সু > ষাণ্ণাতুরঃ।

১৭. এখানে 'ধন' এই উত্তরপদ পরে থাকায় সংখ্যাবাচক 'পঞ্চন্' শব্দের সঙ্গে 'গো' শব্দের তৎপুরুষ (দ্বিগু) এবং এই তৎপুরুষের সঙ্গে যুগপৎ উত্তরপদ 'ধন' শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। 'পঞ্চগবধনঃ' এরূপ বহুব্রীহি সমাস হওয়ার সময় 'পঞ্চগব' এই অন্তর্বর্তী সমাসটি হলো উত্তরপদ দ্বিগু।

১৮. **সমুচ্চয়** – পরস্পর নিরপেক্ষ একাধিক সুবন্ত পদের একটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্বয় হলে তাকে সমুচ্চয় বলে। পদার্থের পরস্পর-নিরপেক্ষতাহেতু 'সমুচ্চয়' অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস হয় না। যেমন– 'ঈশ্বরং গুরুঞ্চ ভজস্ব' এই বাক্যে একটি মাত্র 'চ' অব্যয় থাকায় 'ঈশ্বরং ভজস্ব' বললে 'গুরুঞ্চ' এই অংশের জন্য আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাছাড়া এখানে ঈশ্বর ও গুরু এক ভজনক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেও তারা যুগপৎ নয়, পৃথকভাবে অন্বিত, কারণ একই সময়ে ঈশ্বর ও গুরুর ভজন সম্ভবপর নয়। উক্ত দুজনের ভজনা করতে হলে একজনের ভজনা আগে এবং অন্যজনের ভজনা পরে করতে হবে। অতএব এই পৃথক ভজনের ফলে ঈশ্বর ও গুরু সাপেক্ষ নয়, আর সাপেক্ষ না হওয়ায় এখানে সমাস হয় না।

অন্বাচয় – দুটি পদার্থের একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল হলে (অর্থাৎ দুটি পদার্থের মধ্যে 'প্রধান-অপ্রধান' ভাব থাকলে) 'চ'-এর অর্থ অন্বাচয়। যেমন– বালক! ভিক্ষামট গাঞ্চ আনয়। ভিক্ষা করাই প্রধান এবং গো-আনয়ন অপ্রধান। একটি অপরটির আনুষঙ্গিক হলেও প্রধান-অপ্রধানভাবে উভয়ই বালকের সঙ্গে অন্বিত, কিন্তু 'ভিক্ষামট' বলার পর অবশিষ্ট অংশের ('গাঞ্চ আনয়'-এর) জন্য আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাছাড়া ভিক্ষা করা ও গো-আনয়ন ক্রিয়া দুটি যুগপৎ নয়, এই দুই কার্য যুগপৎ সম্পাদন করা বালকের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই ভিক্ষা ও গো 'চ' দ্বারা যুক্ত হলেও পরস্পর সাপেক্ষ নয়। সাপেক্ষতার অভাবহেতু এখানে সমাস হয় না।

গ্রন্থপঞ্জি

অজিত কুমার গুহ ও আনিসুজ্জামান, ১৯৯৭। *নতুন বাংলা রচনা* (সপ্তদশ সংস্করণ), মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

অশোক মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৯। *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা।

ঋষি দাস, ১৯৮১। *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ।

করুণাসিন্ধু দাস, ২০০৫। *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, স্বদেশ, কলকাতা।

গুরুপদ হালদার, ১৩৫০। *ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস,* কলিকাতা।
জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ,* আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা. লি.), কলিকাতা।
পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য , ১৯৮৯। *ভাষাবিদ্যা পরিচয়,* জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা।
প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী, ১৯৯৪।*পাণিনীয়ম্ (A Higher Sanskrit Grammar and Composition*), দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরি, কলিকাতা।
বিশ্বরূপ সাহা, ১৯৯৭। *বেদভাষানির্মিতি,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।
মাহবুবুল হক, ২০০২। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি,* বই প্রকাশনী, ঢাকা।
মুহম্মদ এনামুল হক, ২০০৩। *ব্যাকরণ মঞ্জরী,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৩৮৩/১৯৭৬। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (দ্বি.মু.), প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা।
মুহাঃ মনসূর উর রহমান, ২০০৫। *ভাষা পরিক্রমা* (দ্বিতীয় পর্ব), জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।
রফিকুল ইসলাম, ২০০১। *বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা* (পুনর্মুদ্রণ; প্র. সং ১৯৯৮), গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা।
সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভট্টোজী দীক্ষিত, ১৯৭৮। *বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী* (সমাস-প্রকরণ), শিক্ষা সংঘ, শিউড়ি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।
সুকুমার সেন, ২০০৪। *ভাষার ইতিবৃত্ত,* আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা. লি.), কলিকাতা।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ,* কলকাতা।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২০০১। *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ,* বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা।